সপ্তদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, বৈশাখ, ১৩৩৬। | তৃতীয় সংখ্যা।

রামায়ণী যুগের ভাষা

(স্বর্গীয় কেদারনাথ মজুমদার।)

রামায়ণী যুগের পূর্ব্বে আর্য্য সমাজে দেবভাষা ও মনুষ্য-ভাষা প্রচলিত ছিল। বেদগুলি দুরূহ দেবভাষায় রচিত ছিল। এই দেবভাষাও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য দীর্ঘতমা ঋষির মন্ত্র * উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তৎকালে চারি প্রকারের ভাষা ব্যবহৃত হইত। ইহার তিন প্রকার ভাষা সাধারণের অবোধ্য দেব-ভাষা এবং চতুর্থ প্রচলিত মানুষ-ভাষা। সায়নের এই মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া যাজ্ঞিকেরা বলেন যে, ত্রিবিধ দুরূহ ভাষায় বেদ রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রথম মন্ত্রের ভাষা, দ্বিতীয় কল্পের ভাষা ও তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষা। চতুর্থ ভাষা প্রচলিত লৌকিক ভাষা। নৈরুক্তেরা বলেন ঋক্ যজু ও সামের ভাষা পৃথক পৃথক তিন প্রকার, চতুর্থ ভাষা লৌকিক ভাষা। নৈরুক্তেরা যাজ্ঞিক-প্রদর্শিত কল্প ও ব্রাহ্মণকে বেদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিচার করিয়াছেন।

নিরুক্ত পরিশিষ্ট-ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে :—

ব্রাহ্মণা উভয়ীং বদন্তী যাচ দেবানাং যাচ মনুষ্যানাং। ১।৯

অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা দেবভাষা ও মনুষ্যভাষা উভয় ভাষাতেই কথোপকথন করিতেন।

এই উক্তি বেদের ব্রাহ্মণভাগ রচিত হইবার সময়ে প্রযোজ্য। ব্রাহ্মণ রামায়ণের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। কেন না রামায়ণে ব্রাহ্মণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। †

* চত্বারি বাক্ পরিমতা পদানি তানি বিদু ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহাত্রীণি নিহিতা নেং গয়ন্তি তুরিয়ং বাচঃ মনুষ্যা বদন্তি। ১।১৬৪।৪৫

† ত্র্যহোহশ্বমেধ সখ্যাতঃ কল্পসূত্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ।
চতুষ্টোম স প্রথমং পরিকল্পিতম্। আদি। ১৪।৩০

রামায়ণের সময় দুরূহ দেবভাষার প্রচলন উঠিয়া গিয়া রামায়ণী বিশুদ্ধ ও সহজ সংস্কৃতের প্রচলন হয় এবং এই বিশুদ্ধ সরল ভাষায় রামায়ণের শ্লোকরচনা হয়। এই সময় ব্রাহ্মণ ও উচ্চ শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও নাগরিক এবং স্ত্রীলোকেরা মিশ্রভাষায় কথোপকথন করিতেন আমরা রামায়ণের আলোচনার দ্বারা এই বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

আরণ্যকাণ্ডের ১১শ সর্গে ইল্বল-বাতাপি উপাখ্যানে লিখিত হইয়াছে :—

ধারয়ন্ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ॥

ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক সংস্কৃতে কথা বলিয়া শ্রাদ্ধের ছলনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রিত করিত।

তখন অনার্য্যদিগের মধ্যে পৈশাচী ভাষা ব্যবহৃত হইত। এই পৈশাচী ভাষা অনার্য্যভাষা নামে অভি-হিত হইত।* এই পৈশাচী বা অনার্য্যভাষার লক্ষণ

*ডাক্তার মুইর তাঁহার Original Sanskrit Texts &c- নামক গ্রন্থে যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে কোন্ কোন্ স্থান পিশাচ দেশ অন্তর্গত ছিল তাহা অবগত হওয়া যায়। শ্লোকাংশ এইরূপঃ—

পাণ্ড-কেকয়-বাহ্লীক-সহ্য-নেপাল-কুন্তলা।
সুধেশ-ভোট-গান্ধার-হৈব-কনোজনা স্তথা॥
এতে পিশাচ দেশাঃ স্যুস্তদ্দেশ্য স্তদ্গুণো ভবেৎ। Vol. 11. P. 48

Dr. W. W. Hunter বলেন "Paishachi loosely applied to out-lying Non- Aryan dialects from Nepal to Cape Comorin—(Indian Empire, P. 337)

যে সকল স্থানে অনার্য্যবসতি ছিল এই উভয় উক্তি সাধারণতঃ ঐ সকল স্থানকে লক্ষ্য করিতেছে।

কি রামায়ণে তাহার আভাস পাওয়া যায় না। সে যাহাই হউক, অনার্য্যগণের এই পৈশাচী ভাষার ব্যবহার করিলে ইহল অনার্য্য প্রতিপন্ন হইবে এবং অনার্য্য ভাষানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবে না, ইহা চিন্তা করিয়াই সে ব্রাহ্মণ সাজিয়া সংস্কৃত কথা বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে মোহিত ও স্বকার্য্য সাধিত করিত।

অন্যত্র হনুমান্ অশোকবনে সীতাকে দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতেছেন "এখন কি ভাবায় সীতার সহিত আলাপ করিতে হইবে।" তাঁহার চিন্তা হইল :—

যদি বাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি॥ সুন্দরা ৩০।১৮

যদি ব্রাহ্মণের ন্যায় সংস্কৃতে কথা বলি, তবে আমাকে নিশ্চয় মায়ারূপী রাবণ বলিয়া সীতা ভীতা হইবেন। সুতরাং অনেক চিন্তার পর হনুমান্ স্থির করিলেন :—

বাচঞ্চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কৃতাং॥ সুন্দরা। ৩০।১৭

মানুষী সংস্কৃতে সীতার সহিত কথোপকথন করিতে হইবে।

উপরি উদ্ধৃত অংশ হইতে পূর্ব্বোউদ্ধৃত নিরুক্ত-পরিশিষ্ট ভাষ্যের সমর্থন দ্বারা যে আমরা দেবভাষা ও মনুষ্য ভাষার উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি, তাহার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। নিরুক্ত-পরিশিষ্ট ভাষ্যে যাহাকে দেবভাষা বলা হইয়াছে রামায়ণে তাহাকেই ব্রাহ্মণকথিত সংস্কৃত ভাষা বলা হইয়াছে। নিরুক্তের মানুষভাষা রামায়ণেও মানুষভাষা নামেই পরিচিত রহিয়াছে দেখা যাইতেছে।

এখন এই মানুষ ভাষা কি এবং তাহার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক।

যাঁহারা হনুমানকে লাঙ্গুলধারী মর্কট বলিয়া কল্পনা করেন তাঁহারা বলিবেন, সীতা বানরের কথা বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া হনুমান্ মানুষের ভাষায় কথা বলিতে সংকল্প করিয়াছিল। এইরূপ কল্পনা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়া আমরা প্রথমেই নিরুক্ত পরিশিষ্ট ভাষ্যের মত উদ্ধৃত করিয়া দেবভাষার ও মনুষ্যভাষার প্রচলন দেখাইয়া আসিয়াছি।

সাধারণের কথিত ভাষাই মানুষভাষা। এই মানুষভাষা ও প্রাকৃত ভাষা এক। অনেক প্রাকৃত ভাষাকে বৌদ্ধ পালি ভাষার সহিত অভিন্ন মনে করেন। কেহ বা মহারাষ্ট্রী শূরসেনী প্রভৃতি ভাষকে প্রাকৃত বলেন। রামায়ণে মিশ্র ভাষার উল্লেখ আছে। রামায়ণের টীকাকার রামানুজ সংস্কৃত ও প্রাকৃত মিশ্রিত ভাষাকেই সেই মিশ্রভাষা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জর্ম্মণ পণ্ডিত বেবার প্রাকৃত ভাষাকে বৈদিক ভাষার সমসাময়িক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। *

মহারাষ্ট্রী ও পালী প্রভৃতি ভাষা যে প্রাকৃত ভাষারই রূপান্তর তাহা বলাই বাহুল্য।

রামের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম সর্গে লিখিত হইয়াছে :—

"শ্রৈষ্ঠং শাস্ত্রসমূহেষু প্রাপ্তো ব্যামিশ্রকেষু চ।" ২৭

অর্থাৎ মিশ্রভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রসমূহে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

মিশ্র-ভাষায় নাটক ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্র রচিত হইতে পারে না। কেননা, নাটকে যে প্রকৃতির লোক যে ভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকে তাহাকে সেই ভাষাতেই কথা বলাইতে হইবে—"রাম প্রাকৃতাদি ভাষা সমন্বিত নাট্য শাস্ত্রাদিতে পারদর্শিত্ব লাভ করিয়াছিলেন ‡ আমাদের বিশ্বাস এই মিশ্র ভাষাই আর্য্য ভারতে সাধারণ কথিত ভাষা বলিয়া পরিচিত ছিল এবং এই কথিত ভাষাকেই হনুমান্ মানুষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর্য্যভাষা সম্বন্ধে রামায়ণে অন্য কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।

বানর, নাগ, পক্ষী, রাক্ষস প্রভৃতি অনার্য্যজাতি পৈশাচীভাষা ব্যবহার করিত। রাম এই পৈশাচীভাষাও যে শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহাও উপর্য্যুক্ত শ্লোক হইতে অনুমান করা যাইতে পারে। নতুবা রামের পক্ষে বিরাধ ও শূর্পনখার সহিত কথোপকথন সম্ভবপর হইত না।

রাবণ উত্তম সংস্কৃত ভাষায় বাক্যালাপ করিতেন। সীতাহরণের পূর্ব্বভাগে তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সীতার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ‡

লঙ্কায় আর্য্য ভারতের মানুষী ভাষা অপ্রচলিত ছিল, তাই হনুমান্ সীতার সহিত মানুষী ভাষায় বাক্যালাপ করাই নিরাপদ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

---

* "উপাসক সম্প্রদায়", দ্বিতীয় ভাগ পরিশিষ্ট।

‡ ব্যামিশ্রকেষু—প্রাকৃতাদি ভাষা মিশ্রিত নাটকাদীষু। রামানুজ।
ব্যামিশ্রকেষু—অর্থে প্রাকৃতের সহিত ভারতবর্ষের সকল ভাষাই গণনা করা যাইতে পারে।

‡ আরণ্য কাণ্ড ৪৩ সর্গ ১৪ শ্লোক।

অভিশপ্ত

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

(শ্রীসুরেন্দ্রলাল সেন, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যরত্ন।)

বাদলার দিন,—অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর, আকাশে,—মেঘের ফাঁকে,—সূর্য্যদেব আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। কাল মেঘের পার্শ্বে, সাদা মেঘগুলি ভাসিয়া ভাসিয়া,—নীল আকাশের ম্লান-বিষণ্ণ-ছবিখানিকে যেন অনেকটা উজ্জ্বলতর করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। এমনি সময়ে, একটি সুসজ্জিত ছোট কামরার একপার্শ্বে, জানালার সম্মুখে, দৌলতন্নেছা একাকী উপবেশন করিয়াছিল। জানালার উপর পাতলা সবুজ রঙের একখানা পর্দ্দা ঝুলিতেছিল, পর্দ্দার একপার্শ্বে, মুখ বাহির করিয়া, দৌলতন্নেছা আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চাহিয়াছিল।

আকাশ যদিও, প্রতিদিনের মত, তেমনি নীল, বিপুল, দেখাইতেছিল, কিন্তু সেই দৃশ্য, তাহার মনকে, পূর্ব্বের ন্যায় স্নিগ্ধ করিতে পারিতেছিল না। সমস্ত আকাশ যেন, সাহাজাদার অন্তরের মতই, ভাবান্তরের ক্রুরতায়, লীন হইয়া গিয়াছিল। ইদানীং তাহার মনে হইতেছিল,—বিশাল সুনীল আকাশার্দ্ধ যেন, ভাঙ্গা দালানের ছাদের মতই, তাহার মস্তকে পতিত হইয়াছে,—যাহার রুদ্ধ চাপে সে যেন দলিত ও আহত হইয়া, আড়ষ্ট অভিভূতবৎ জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়ছে! তাহার বাহিরটা যদিও রুদ্ধ-স্রোত-নদী-বক্ষের মতই স্থির দেখাইতেছিল, কিন্তু বুকের ভিতর একটা প্রবল হাহাকার, হৃদ-যন্ত্রের পতন উত্থানের সহিত, অরুন্তুদ যন্ত্রণার তালে বাজিতেছিল!

দৌলতন্নেছা বিবির বয়স পঞ্চদশের অধিক না হইলেও, সে যে বয়সের অনুপাতে, অনেকটা অধিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল,—তাহার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখমণ্ডলেই প্রতীত হইতেছিল। তাহার স্নিগ্ধ-গোলাপী-রঙের-দেহে, একটা মনোরম মাধুর্য্যের প্রলেপ মাখান ছিল। সে তাহার সুঠাম-ক্ষীণ-দেহ বল্লরী লইয়া যেখানেই উপস্থিত হইত, সেখানেই কেমন এক শান্ত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া, সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইত! তাহার বেশভূষায় ইদানীং কোনই পারিপাঠ্য ছিল না,—মুখের চির উজ্জ্বল হাসিটুকুন যেন ম্লান হইয়া গিয়াছিল! চোখের কোণে, অশ্রু-বিন্দু ও অভিমানের একটা অসীম দ্বন্দ্ব, সর্ব্বদাই, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল! যিনি তাহাকে এই অশান্তিময় জীবন সমস্যার মাঝখানে আনিয়া ফেলিয়াছিল, তাঁহার প্রতি একটা দুর্জ্জয় অভিমানের উৎস আত্মপ্রসারণ করিয়া, নয়নের তপ্ত অশ্রুধারাকে, রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল!

দৌলতন্নেছা বিবি—নবাব সাহেবের দূর সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্রী। অতি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন হইয়াছিল। ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয় বলিতে সংসারে তাহার কেহই ছিল না। এই নিঃসহায় বালিকা, বাদসার সংসারে অধিষ্ঠিত হইয়া, খোদ বেগম সাহেবের মাতৃ স্নেহ-ধারায়, স্বীয় চিত্তকে অভিসিঞ্চিত করিয়া লইয়াছিল! বেগম লুৎফুন্নেছা, প্রথম দর্শনেই, স্বর্গের কুসুম সদৃশ্য, সাদা হাস্য বিকশিতা নয়নানন্দ-বর্দ্ধক অনাথা শিশুটিকে ভালবাসিয়াছিল! তাঁহার ব্যবহারে মনে হইত, তিনি যেন, খোদার আদেশে, অজ্ঞাত কোন স্বপ্নরাজ্য হইতে অবতীর্ণা হইয়া, অমৃতের উৎস লইয়াই, বালিকার অনাদৃতও ঘাতপ্রতিঘাত পূর্ণ, প্রচ্ছন্ন উদ্বেগভরা অন্তরে, অসীম পুলক-স্পন্দন প্রবাহিত করাইয়া দিয়াছিলেন!

শৈশবকাল হইতেই দৌলতন্নেছা সাহাজাদার সহিত একত্র খেলাধূলা করিয়া কাটাইয়াছিল! ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই, এক অজ্ঞাত ভাব প্রবণতার ফলে, উভয়েই উভয়ের প্রতি, চুম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট হইল! দৌলতন্নেছার অবাধ-স্বচ্ছন্দভাব, আন্তরিকতাময় আচরণ, কুণ্ঠাশূন্য—নির্ম্মল প্রীতিপূর্ণ সহৃদয়তা, সাহাজাদার অন্তরকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল! ক্রমে তাহাদের অন্তরের ভিতরকার উত্তাল শোণিত স্রোত, এতই উদ্দম ভাবে নৃত্য করিতে লাগিল যে, তাহারি গতিবেগে, তাহাদের অন্তরের সমস্ত সঙ্কোচের বাঁধ ছিন্ন হইয়া গেল। সাহাজাদা, দৌলতন্নেছাকে জীবন সঙ্গিনী করিয়া লইবার সংকল্প, নিতান্ত সহজ-ভাবে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠাবোধ করিল না! যাহাকে জীবনের অরুণ প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া, যৌবন পথে টানিয়া লইয়াছিল, তাহাকে জীবনের সায়াহ্ন পর্য্যন্ত স্নেহ ভালবাসার প্রচুরতায় অভিষিক্ত করিতে সাহাজাদা ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দৌলতন্নেছা শান্ত, সংযত, সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত ধৈর্য্যতার সহিত অটল মূর্ত্তিতে চলিতে চেষ্টা করিলেও, সাহাজাদার

জানিয়ে ছিলেন, মতিয়াকে আমি গ্রহণ কত্তে চাইলে,—তোমাকে তিনি সৎপাত্রে অর্পণ করে, তোমাকে সুখী কত্তে চেষ্টা করবেন। পাত্র তিনি নাকি এক রকম ঠিকই করে রেখেছেন।"

দৌলতন্নেছা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল" তুমি কি মত প্রকাশ করেছ—আমাকে জানাবে কি? আমার নিকট কিছুই গোপন করো না এই আমার অনুরোধ!"

সাহাজাদা বিনম্র কণ্ঠে বলিল" কোন কিছুই গোপন করবনা তোমার নিকট, আমি মতিয়াকে গ্রহণ করবার সপক্ষে মত দিয়েছি! মতিয়া যদি স্বইচ্ছায় বিবাহে মত দেয় তবে আমার মনে হয় হোসেন আলীর সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে। হোসেনআলী যেমন সুশ্রী, তেমনি সুপণ্ডিত, এমন ভাল ছেলে আমাদের এ অঞ্চলে আর নেই বল্লেই হয়। দৌলত! অতীতের সব ভুলে যাও। নূতন ভাবে, আবার জীবন পত্তন করে, সুখী হও, এই আমার একান্ত অনুরোধ। বাবা ভয়ানক জিদী লোক, এ বিষয়ে তিনি অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন, তাঁর সংকল্প কার্য্যে পরিণত করাবেনই, কোন কিছুতেই কিছু আটকাতে পারবেনা। তুমি আমাকে ভুলে—"

কথায় বাধা দিয়া দৌলতন্নেছা দৃঢ় স্বরে বলিল "তোমাকে ভুলে অপরকে আপন করে নিতে উপদেশ দিচ্ছ? তুমি পুরুষ, এ কথা তোমাদেরই সাজে, তুমি যদি আমার অন্তরের ভিতরটার সাড়া নিতে পারতে, কত বড় আগুন বুকে জ্বালিয়ে পুড়ে মরছি, তা যদি অনুভব কত্তে চাইতে, তবে এমনি ভাবে আমাকে পায়ে ঠেলে দিতে চাইতে না। তোমার অন্তর যে এত কঠিন, তা'ত এখন ও ধারণা কত্তে পাচ্ছি না, তবে মনে রেখো, তুমি মত দিলেই যে আমার সে ভাবে চল্‌তে হবে, এমন কোন নিয়ম নেই। তুমি মতিয়াকে গ্রহণ কর, তুমি মতিয়ার হও, কোন বাধা দিবনা, বাধা দিবার শক্তিও আমার নেই। তবে আমি তোমা ছাড়া আর কারোই হতে পারি না, বা হবনা, এটা তুমি বেশ জেনে রেখো। তুমি আমার ছিলে,—এখনও আছ,—যতদিন বেচে থাকব, তত-দিন তুমি আমারই থাকবে। তুমি আপনাকে ইচ্ছামত বিলিয়ে দিতে পার,—কিন্তু প্রকৃত স্ত্রী, কোন দিনই,—এমনি করে ভালবাসাকে যাচ্ঞাই কত্তে পারে না। আমার জীবনের যা কাম্য, যা প্রিয়,—সকলই তোমার চরণে অর্পণ করেছি, ফিরিয়ে নেবার অধিকার ত আমার নেই! যদি এ বিষয়ে কেহ বল প্রয়োগ কত্তে চায়,—আমাকে অপরের হস্তে জোর করে বিলিয়ে দিতে চায়,—তবে মনে রেখো, দৌলত! সেদিন পৃথিবী ছেড়ে যেতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করবনা! সংসারের লীলা সাঙ্গ করে,—পরলোক বলে যদি কিছু থাকে,—সেখানে গিয়েও তোমার ধ্যান কর্‌ব,—উদ্‌গ্রীব আগ্রহে তোমার অপেক্ষা কর্‌ব,—এতে বাধা দিবার ত কেউ থাক্‌বে না! প্রিয়তম্! তুমি মনে রেখো,—খোদা বলে যদি কেউ থাকেন,—তবে এই মাতৃ পিতৃহীন অনাথার আকুল-আহ্বান একদিন তিনি শুন্‌বেনই—। তিনি তাঁর নিরপেক্ষ বিচার আসনে বসে, দেখিয়ে দিবেন, তুমি আমারি জীবন দেবতা তুমি আমারি সর্ব্বস্ব—।" দৌলতন্নেছার আর বাক্যস্ফুরণ হইল না,—কণ্ঠ যেন রোধ হইয়য়া আসিল। সে বস্ত্রাঞ্চলে নয়ন যুগল আবৃত করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিল। শেষে উন্মত্তের ন্যায়—স্খলিত চরণে স্বীয় শয়ন কক্ষের শয্যায় আশ্রয় লইয়া, রুদ্ধ অশ্রু-প্রবাহ মুক্ত করিয়া দিল। তাহার সেই ক্রন্দন উচ্ছ্বাস, কতটুকুন মর্ম্মস্পর্শী ও অসহনীয়,—সাহাজাদা তাহার কোন হিসাব করিতে সমর্থ হইয়াছিল কিনা,—কে বলিতে পারে?

(ক্রমশঃ)

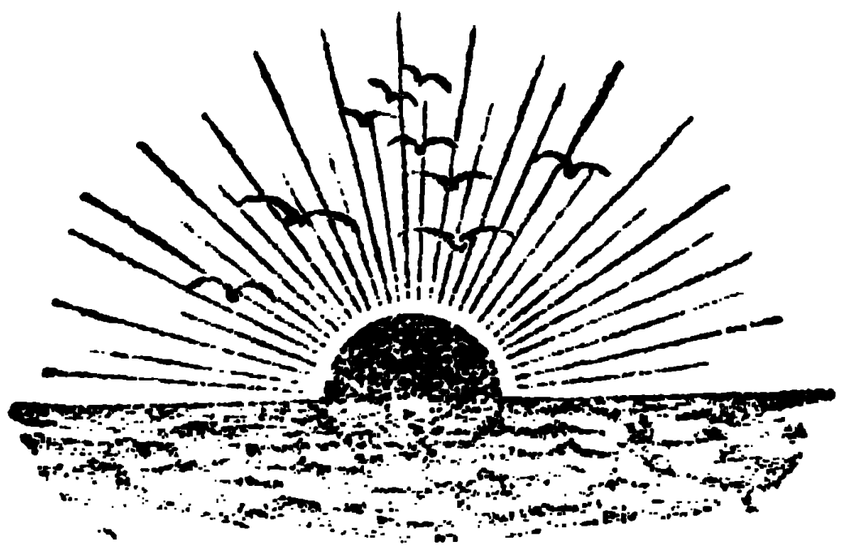

কাশীরাম দাস ও এইরূপই বলিয়াছেন—"

"শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।"

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী ও বলিয়াছেন—

সেই কথা কহি আমি পয়ারের ছলে
মোর নিবেদন শুন পণ্ডিত সকলে॥
ভাষা ছন্দে কহি নাহি সমস্কার জ্ঞানে।
শুদ্ধাশুদ্ধ থাকে যদি করিবা শোধনে॥"

সকলেরই একই কথা। কেহই সংস্কৃতজ্ঞতার দাবী করেন নাই। সকলেই লোক মুখে শুনিয়া "পয়ার" "পাচালী" বা "ভাষা-ছন্দে" রচনা করিয়াছেন। এই "লোক মুখে শুনিয়া" বা "শ্রুতমাত্র" বলিতে কথক ঠাকুরের বক্তৃতাও হইতে পারে, অন্যকৃত পাঁচালী শ্রবণও হইতে পারে, অন্যকৃত পাঁচালী শ্রবণই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কেননা, যেরূপ ভনিতা আমরা ত্রিলোচন ও কাশীদাসে পাইয়াছি, ঠিক সেইরূপ ভনিতাই সঞ্জয়েও আছে।

সঞ্জয় লিখিয়াছেন—

১। মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
সঞ্জয় কহিল তাহা শুনে পুণ্যবান্। বনপর্ব্ব

২। মহাভারতের কথা অমৃত সমান!
সঞ্জয় পয়ার কহে শুনে পুণ্যবান্॥ ঐ

৩। মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
সঞ্জয় কহিল তাহা ভব ভয় তরি।

৪। মহাভারতের কথা পীযুষের ধার।
বিরাট পর্ব্বেতে কহে সঞ্জয় পয়ার॥
বিরাট পর্ব্ব

৫। গোবিন্দ চরণে মন, সঞ্জয়ের বিরচণ,
বন পর্ব্বে ব্যাসের কাহিনী॥

এই সকল ভনিতার সঙ্গে ত্রিলোচনের—

(১) দ্বিজ ত্রিলোচন কহে বন্দিয়া শ্রীহরি।
শ্রবণে ভারত কথা হেলে ভবতরি॥

(২) মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।

প্রভৃতি পাঠ করিলে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়,—এ তিনজনই একটি ভাণ্ডার হইতে এই ভনিতাগুলি আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। সে ভাণ্ডার যে, কোন পুরাতন পাঁচালী, তাহাতে সন্দেহ নাই। সঞ্জয়, ত্রিলোচন, বা কাশীদাস, কেহই "সংস্কৃতানভিজ্ঞের অনধিগম্য মহাভারতরূপ মহা-ভাণ্ডার" লোকের নিকট উন্মুক্ত করেন নাই। তাহারা সকলেই এক পুরাতন ভাণ্ডারের দরজা খোলা পাইয়া আপন ইচ্ছা ও রুচিমত মণিরত্ন কোচড়ে পুরিয়াছেন।

কাশীরাম দাস,—বর্দ্ধমান জেলার। ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী টাঙ্গাইল মহকুমার। সঞ্জয়ের নিবাস কোথায় ছিল, এখনও নিঃসংশয়ে নির্ণীত হয় নাই। বিরাট পর্ব্বের সমাপ্তি স্থলে সঞ্জয় লিখিয়াছেন—

"দ্বিজকুলে উপজিল পূর্ব্বদেশে জাত।
ভারত পাঞ্চালী কহিল লোকের সাক্ষাত॥"

ইহা হইতে জানা যাইতেছে, সঞ্জয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার নিবাস "পূর্ব্বদেশে" ছিল। রাঢ়ের লোকে, পদ্মার পূর্ব্ব সমস্ত স্থানকেই পূর্ব্বদেশ বলে। এ পূর্ব্বদেশ, পদ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত। কাজেই সঞ্জয়ের নিবাস কোন্ গ্রামে বা কোন্ পরগণায় ছিল, নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যাইতেছে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে, পদ্মা হইতে পূর্ব্বদিকে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে কোন গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল।

কামাখ্যার কৌমার্য্য

(শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়)

ধরণীর বুকে সে ছিল এক জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রি। পাশাপাশি দুইখানা আরাম কেদারায় হেলান দিয়া স্বপ্নাহতের মত বসিয়াছিলাম কামাখ্যা আর আমি। অদূরেই একটা ঘাসবনের উপর চন্দ্রকিরণের ঢেউ বহিয়া যাইতেছিল। অপরের দৃষ্টিটা সেইদিকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম দেখ অজয়, জ্যোৎস্নাধারায় সমুজ্জ্বল হয়ে এক একটা শিশির কনিকা কিরকম সোণালী হয়ে উঠেছে। হায়! কোন কল্পলোকের রূপপরিদের মিলন অশ্রু এরা কে জানে!"

কি একটা মুগ্ধ আবেশে কামাখ্যা তখন একেবারে তন্দ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল; কথাটার জবাব স্বরূপ সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। নিজ স্নিগ্ধ দৃষ্টি সেই শিশির-স্নাত ঘাসবনটার উপর প্রসারিত করিয়া দিয়া সে সংক্ষেপে

জানাইল "শুনে তুমি আশ্চর্য্য হবে এমনি একটা সুন্দর জ্যোৎস্না বিধৌত রাত্রির স্মৃতি চিরদিনের জন্য গেঁথে আছে আমার অন্তরে—আর তাই হয়েছে আমার কুমার জীবনের মূল শিকড়।"

কথা শুনিয়া গা আমার পুলক বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এমনি একটা জ্যোৎস্না বিধৌত রাত্রির স্মৃতি চিরদিনের জন্য গাঁথিয়া আছে অজয়ের অন্তরে,—আর তাই হইয়াছে তার কুমার জীবনের মূল শিকড়! ব্যাপারটা আমাকে কম বিস্মিত করিয়া দেয় নাই। এতদিনের প্রচণ্ড প্রশ্রয়েও কামাখ্যার জীবনে যে কুমারব্রতের কোন হেতু খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি নাই, তবে কি এ তাই! মিনতিমাখা দৃষ্টিটা তাহার দিকে মেলিয়া দিয়া বলিলাম "এমনি একটা রঙ্গমাই যদি তোমার কুমার জীবনের মন্ত্র নির্দ্দেশ করে থাকে, আজকে এই শুভ মুহূর্ত্তে বলবে সেটা আমার কাছে?—তুমিত জান সে কতদূর উপভোগ্য হবে!

জীবন মরু।

মিনিট দুই তিন কামাখ্যার দিক হইতে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। অশান্ত বিহ্বল চোখদুটী সেই ঘাসবনটার দিকে নিবদ্ধ রাখিয়া নিজের সাথে সে কি বোঝাপড়া করিতেছিল কে জানে! তারপর কতকটা আনমনেই যেন বলিয়া উঠিল "আমার কুমারব্রতের ইতিহাস শুনবার জন্য তোদের শত কৌতূহলের কোন মূল্যই আমি এতদিন দিইনি, কিন্তু আজ আর চুপ করে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। এতদিন যে সত্য কাহিনীকে আমার ওই অন্তঃস্থলটায় সুনিবিড় করে গুজে রেখেছিলুম আজ তা প্রকাশ পাবার পুলকে আপনি বের হয়ে আস্‌ছে।

কতক্ষণের জন্য কারও মুখে কথা ফুটিল না। হয়ত কামাখ্যার দিক হইতে এমনি একটা ক্ষুদ্র নীরবতার খুবই প্রয়োজন ছিল। কি একটা গুমরিত বেদনায় তার মুখ ক্ষণেকের জন্য ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছিল, তারপর কতকটা সুস্থ হইয়াই সে তার কুমারব্রতের ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিল।—আর চোখে মুখে একটা অনিবার্য্য কৌতূহলের ভাব নিয়া আমি তাহাই শুনিতে লাগিলাম।—

তার নাম ছিল মাধুরী, আর সে ছিল ঠিক মাধুরীরই প্রতিমূর্ত্তি। কল্পলোকের সমস্ত লাবণ্য ফুটে উঠেছিল তার ভিতর। রূপ কথার ফুল রাণীর কথা জানে সবাই কিন্তু কেউ তাকে চোখে দেখতে পাওনি—এ যেন ছিল ঠিক তাই। অন্ধকার ঘরে প্রদীপের আলোর মত ঘরে পড়ত তার রূপ, দর্শকের হৃদয় আপ্লুত করে ঘরে যেত জ্যোৎস্না ধারার মত তার দীপ্ত মধুর হাসি।

পাশের বাড়ী। সেও আসত, আমিও যেতুম।—ছোটবেলা থেকে এমনি ভাব। আমার সাথে বসে না পড়লে তার পড়া শিখা হতোনা; তার নূতন বইয়ে বড় বড় অক্ষরে নামটা লিখে দেবার অধিকার ছিল শুধু আমারই একচেটে।—খেলা মেশাটা ছিল এমনি মধুর এমনি জীবন্ত।

ভোরবেলা উঠে ফুল তোলবার জন্য সে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত—ঘোষেদের সেই বাগান বাড়ীর দিকে। এক হাতে ফুল গাছের শাখাটা আমি নুইয়ে ধরতুম, আর সে সাজি ভরে ফুল তুলত। শীতের দিনের ফুর ফুরে বাতাসে ভোরবেলা যখন গা কাটা দিয়া উঠত, তখনও আমাদের এ ফুল কুড়ানোর বাতায় কোন দিন ঘটেনি—কাজটা ছিল এমনি সাধের, এমনি মধুর।

এসব হল ছোটবেলার কথা। তারপর কোন্‌দিন কৈশোরের কবল মুক্ত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছিলুম তা টেরও পাইনি।

রিপণ কলেজে বি, এ পড়ছিলুম, আর মাধু তার পিতার অভিপ্রায় মত কলেজের উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর না হয়ে বাড়ীতে যথাসম্ভব পড়াশুনা চালাচ্ছিল। আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে তার বাবা উমাচরণ বাবুর সংস্কার এই ছিল যে মেয়েরা স্কুল কলেজের তথা কথিত উচ্চ শিক্ষায় অগ্রসর হয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়। অভিভাবকের পক্ষে তখন আর তাহাদিগকে নিজ মনোনীত মঙ্গলকর পথে চালানো সম্ভবপর হইয়া উঠে না, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারেও তাহারা দেশের চিরন্তন সমাজ ধর্ম্ম মেনে চলতে চায় না, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উমানাথ বাবু ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। তার উপর তার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী বর্ত্তমান ছিলেন। কাজেই মাধুর সম্বন্ধে এমনি একটা ব্যবস্থা যে হবে আমরা জানতুম্। মাধুর

সুরেই বল্লুম "তুমি বোধ হয় জান না মাধু, তোমার সাথে আলাপ আলোচনা করবার আর কোন সুযোগ যাবার আগে আমার ঘটে উঠ্‌বে না। কাজেই বল্‌ছি আমার কাছে ব্যক্ত করবার যদি তোমার কিছু থেকে থাকে তবে সেটা এখনই বল্‌তে হবে। এইবার মাধুরী আর চুপ করে থাকতে পারলে না। ব্যথিত স্বরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বল্‌ল "তোমার কাছে বলবার আমার সত্যই কিছু নাই, মন যে আমার কি চায়, আর কাকে আশ্রয় করে তার বিকাশ পেতে চায় তা তুমি বেশ ভাল করেই জান। আমার ভয় হচ্ছে তুমি চলে গেলে চারিদিকের প্রতিকূল আবহাওয়ার ভিতর কি টিকে থাকতে পারব!" মাধুর অভিভাবকেরা কিছুদিন থেকে তার বিবাহের বন্দোবস্ত করতে লেগে গিয়েছিল, শুনেছিলুম কোন এক কুলীন বর দেখে বিবাহ কাজটা সম্পন্ন হবে। সেই সত্য অভিপ্রায়টা লক্ষ্য করেই মাধুরী কথা কয়টী বল্‌ল।

মিনিট পাঁচ কারও মুখ দিয়ে কথা ফুটল না। মাধুরী আনমনে ওই জানালার দিকে চেয়ে থেকে কি ভাবছিল সেই জানে। তবে আমার মন এই চিন্তার রেশটাই আপনার জাল বুনে যাচ্ছিল যে সমাজের বুকে আজও আমরা কুসংস্কারের হাতেরই ক্রীড়া পুতুল। মেয়ে শিক্ষিতা হয়েছে, রূপ লাবণ্য তার যোগ্যটী আর নেই কোথায়, তাকে তার নিজ মনোনীত বরে বিয়ে দিয়ে তার নারীত্বের বিকাশের সুযোগ ঘটিয়ে দিবে, তা না, কোথায় শিক্ষিত অশিক্ষিত, বৃদ্ধ প্রৌঢ়, গণ্ডমূর্খ কুলীন সন্তান রয়েছেন তার হাতে মেয়ে সমর্পণ করে পরকালের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করতে হবে। শুনেছিলুম তার দিদিমার ইহাই ছিল পরম কামনা। আর তার বাপ,—তাঁরও ইচ্ছাটা এমনি বটে। বেশ বুঝছিলুম আমার বিদ্যার জোর তাদের সে কামনার দিকটা পূরণ করে উঠতে পারবে না। তারপর আমার ম্লেচ্ছদেশে যাওয়ার সঙ্কল্পটাও নাকি তাদের রোষদৃষ্টির কারণ হয়েছিল। মনের আগুন চাপতে গিয়ে আপনি বের হয়ে এল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

এতক্ষণে মাধুরী যাবার জন্য উঠে পড়েছিল। আমার দিকে পাছ ফিরে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে বল্‌ল "আমি তাহলে যাই।" আঁচল দিয়ে চোখ মুছে ছুটে চলছিল সে। দ্বিধা সঙ্কোচের বাঁধ অনেকটা কেটে নিয়ে শুনিয়ে বল্লুম যাবার আগে একথাই বলে যাব মাধু, তোমার হৃদয়ের উপর নির্ভর করেই আমি আজ যাচ্ছি। আশা আছে বছর দুই পরে ফিরে এসে তোমায় আমি যা করে হোক আমার করে নিব।"

মাধুরী চলে গেল। চুপ করে বসে থেকে কেবলই ভাবতে লাগলুম্ এই যে একটা দুঃসহ ভার মাধুর উপর দিয়ে গেলুম তাকি ও সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সাথে যুদ্ধ করে রক্ষা করতে পারবে? অভিভাবকেরা কুলীন বর দেখে মাধুর বিয়ে ঠিক করে বসবে, সেখানে কি ওর নিজের অভিরুচি ও খামখেয়ালীর কোন মূল্য থাকবে!—

* * * *

পরের কথা। সাগর পারের বিলেত রাজ্যিটায় বছর দুই বাস্তবিয়া করে, ব্যারিষ্টারী খেতাব বহন করে যখন এই কামাখ্যা চৌধুরী বাড়ীর ধন বাড়ীতে ফিরে এল, তখন ওদিকে যা হবার তা হয়ে গেছে। সংক্ষিপ্ত খবর যা পাওয়া গেল তা এই—আমি যাবার বছর খানেক পরে একজন ৫০ বৎসরের দ্বিতীয় বর কুলীনের সাথে মাধুরীর বিয়ে হয়ে গেছে। ব্যাপারটী এমনি পুরাণো হয়ে পড়েছিল যে সে সম্বন্ধে জানানোর মত এতটুকু আগ্রহ কারও ছিলনা।

মাধুরীর দিকে আমার অনুরাগের কথাটা ভাবতে আর ইচ্ছা হচ্ছিল না। বেশ বুঝে নিলুম শেষ পর্য্যন্ত আমার দিকে মাধুরীর আকর্ষণ টেকসই হয় নি, বিয়ে হবার মধ্যে তার ইচ্ছাটাই হল বড় কারণ। একজন শিক্ষিতা, বুঝাশুনা মেয়ে সে, বাপমার দিকে যতটুকু গোঁড়ামীই থাক না কেন তার সম্মতির আভাস না পেয়ে কি আর কিছু হতে পারে?—তবে বরের বয়স আধিক্যটা আমার কাছে সমস্যাই রয়ে গেল।—বাড়ীতে আমার বিয়ের পাত্রী দেখার কিসব কল কোলাহল চলছিল। মনে মনে আরাম নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললুম ভালই হল যে মাধুরীর কার্য্যের প্রতিশোধ নেবার মত একটা সুযোগ ঘটে যাবার উপক্রম হয়েছে।

পাঠকগণের কবির রচিত কাব্য পাঠের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য নল বাসনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম তাহা পাঠেই কবির প্রতিভার পরিচয় পাইবেন গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন :—

হংসের প্রতি।

"কি কহিলে, হংসরাজ, নরেন্দ্র কাহিনী!
বরিলে কি সুধা-ধারা শ্রবণ বিবরে!
উচাটন মনঃ প্রাণ, অবশ এদেহ
প্রেমরসে; কাঁপিতেছে দুরু দুরু করি।
আঁকিলে হৃদয়-পটে, চিরকাল তরে
সে মধুর শান্ত মূর্ত্তি; কেমনে ভুলিব
সেরূপ মাধুরী! যাহা রাজিছে হৃদয়ে,
বিতরিয়ে অনুপম উজল কিরণ,—
শারদ কৌমুদী যথা সরসী-উরসে।
চির চিন্তা, চির ধ্যান, হইল আমার
সে চারু মোহন রূপ! ইষ্ট মন্ত্র সম
জপিব সে মধু মাখা—সুকোমল নাম।
হৃদয় কানন মাঝে, ধীরে ধীরে বহি
প্রেমানিল, অলক্ষিতে ফুটাইল আজি
মানস কুসুমরাশি; কে পারিবে বল
রাখিতে নিভৃতে ইহা; হংস কুলপতি!
ভানু-প্রেমে ভানুপ্রিয়া নলিনী সুন্দরী
যে বিমল-সুখ (আহা) লভয়ে মনেতে
পারে কি গোপনে তাহা রাখিতে কখন!
অমনি সে খুলি দেয় হৃদয়ের দ্বার।
বাহিরের চারু দৃশ্যে, বন্ধু জনে মম
নেত্র আর নাহি চায়; বাঞ্ছিত কেবল
হেরিতে সেচারু রূপ অঙ্কিত হৃদয়ে।
লজ্জাধীনা কুলবালা, পারিব কেমনে
প্রকাশিতে মুক্তভাবে, হৃদয়ের ভাব?
জানিনা কি পাপে হায়! পৃথিবী ভিতরে
সৃজিলেন বিশ্বপতি কামিনীর কুল;
কামিনীর বক্ষসম কামিনী হৃদয়,
সহসা স্খলিত হয়, পর জন আশে—
পরের লাগিয়ে মরে, পরাধীন প্রাণ,
চিরদিন; মনঃ কথা পারেনা কহিতে
পরজনে মরে যদি লজ্জার কারণ
শতাধিক্ হেন লাজে; প্রেমের অধিক
কিবা আছে প্রিয়তম এভব মণ্ডলে?
প্রাণ দিয়ে রাখি যারে; লোকলজ্জা ছার
তার তরে আচ্ছাদিব সেদিব্য আলোক?
কে পারিবে হেন কায? কে পারে ঢাকিতে
বসনে অনলরাশি, পোড়াইতে দেহ?"

এই কাব্যে ৭টী অধ্যায় আছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। প্রত্যেক অধ্যায়ের কবিতাই অতি মধুর ভাব সম্পন্ন, এবং ললিত পদাবলীতে পরিপূর্ণ।

প্রথম অধ্যায় "হংসের প্রতি।" দ্বিতীয় অধ্যায় "নিদ্রাভঙ্গের পর"। তৃতীয় অধ্যায় "মদনের প্রতি"। চতুর্থ অধ্যায় "চন্দ্র সন্দর্শনে সচকিতে।" পঞ্চম অধ্যায় "কোকিলের ধ্বনি শ্রবণে।" ষষ্ঠ অধ্যায় "পিঞ্জরস্থ শারিকার প্রতি।" সপ্তম বা শেষ অধ্যায় "বিলাস বনে কোকনিতম্বিনীর প্রতি।"

নিদ্রাভঙ্গের পর অধ্যায়ের প্রথমে লিখিয়াছেন :—

হায় সখি! কি দেখিনু নিশার স্বপনে,
শুনিয়ে ছিলেম যাহা হংসরাজ মুখে—
কেমনে বলিব হায়—কুলবালা আমি
লজ্জাবতী; কিন্তু সখি পারিনা রহিতে
ইচ্ছায় কে করে বল প্রলাপ বিকারে?
সে চারু-প্রশান্ত-কান্তি ভারিয়ে হৃদয়ে;
শ্রান্তিহরা নিদ্রা-কোলে ছিলাম মগনা;
সখিরে—এ পোড়া প্রাণ সুধার প্রবাহে
ভাসিল; কে যেন আনি থইল হৃদয়ে
স্নিগ্ধ চন্দ্রকান্ত রূপে সে নব পুরুষে।
সহসা মেলিয়ে আখি; আহা মরি মরি!
দেখিনু সে চারু মূর্ত্তি, যথা চকোরিণী
সতৃষ্ণ নয়নে হেরে, সুধা নিধিচ্ছবি।

প্রত্যেক অধ্যায়েই কবি এরূপ সুন্দর ভাব কবিতায়

আলাদা। এই সব বিভিন্ন মত থাকিতেও আমরা হয়ত এই বলিতে পারি, সাহিত্য হইবে মানবের চরিত্রের একটী দর্পণ। কাল ও দেশ, সমাজ ইত্যাদি তাহার পরিবেষ্টনী। আগেই আমরা দেখিয়াছি, মানব চরিত্র অপরিবর্ত্তনীয়। অতএব অন্য কোন কিছু একযুগের বা একদেশের সাহিত্য সারা পৃথিবী জুড়িয়া স্মরণাতীত কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তবে কি করিয়া সুদূর অতীতের সাহিত্য আজ আমাদের নিকট প্রিয়? তার কারণ একটা ছোট উদাহরণেই বুঝা যাইবে। সবাই দর্পণে আপন আপন মুখ দেখিতে ভালবাসে—সে মুখ গৌর হউক বা কাল হউক। শ্রেষ্ঠ প্রাচীন সাহিত্য এই জন্য আমাদের প্রিয়, যেহেতু তাহাতে দেখিতে পাই আমাদেরই অতি পুরাতন মুখের একটু হাসির রেখা, দুঃখের অশ্রুর একটী অক্ষয় দাগ, প্রেমের গাঢ় রক্তিমরাগ, শুনিতে পাই সেখানে বিরহদগ্ধ হৃদয়ের বুকভরা দীর্ঘশ্বাস। ডারুইনের বিবর্ত্তনবাদ যদি সত্য হয়, তবুও ভয় নাই। আমরা সুদূর ভবিষ্যতে যদি অতিমানবত্ব লাভ করি, তবে আমাদের এযুগের প্রকৃত সাহিত্য তার মূল্য হারাইবেনা। তখন হয়ত ইহা আমাদের নিকট মনে হইবে শিশুকালের অর্থহীন হাসির মতই। হয়ত তখন বয়োবৃদ্ধ অতি মানবের মনে শৈশবের স্মৃতি মনে পড়িবে, হয়ত অজ্ঞাতসারেই তাহার হৃদয়দেশ হইতে একটী দীর্ঘশ্বাস উঠিবে।

এখন দেখা যাউক জীবনের সাথে সাহিত্যের কতটুকু মিল থাকিবে। মহাযুদ্ধের পর সাহিত্যজগতে এক অভিনব চিন্তার হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে, সেই হাওয়া অনেকের মতে নূতন জীবনের দূত, আবার অনেকের মতে বর্ত্তমান সমাজ ও ধর্ম্মের মৃত্যুরই সূচনা। আধুনিক সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের মতে লক্ষ্যভ্রষ্ট এবং প্রকৃত সাহিত্যের বিকৃতি—যেমন পবিত্র বসন্তোৎসবের বিকৃতি চিৎপুর রোডের হোলির মাৎলামি। আধুনিক সাহিত্য পাঠ করিয়া এই ভাবটী হয়ত অনেকেরই মনে আপনি উঠিতে পারে। অনেকে আবার বলিতে পারেন রবীন্দ্রনাথ ঐ যুগের, তাঁহার মন প্রাচীন সংস্কারের হাত এড়াইতে পারে নাই। পূর্ব্বোক্তমত সত্য হইতে পারে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে মনে যে ভয় হয় তাহা কি একেবারে ভিত্তিহীন? সাহিত্যের উদ্দেশ্য অনাবিল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি—একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আধুনিক সাহিত্যের সারবত্তা আলোচনা করিলে অতি সহজেই একটী বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। বৈশিষ্ট্যটি এই—যাহা কিছু নীচ সমাজে বা রাষ্ট্রে, তাহারই জীবনের অগীত-পূর্ব্ব-গীতি আধুনিক সাহিত্যে শুনিতে পাই। দরিদ্রের ভাঙ্গা ঘরের জীবনের করুণ ইতিহাস, পতিতের জীবনের আলোক এবং আঁধার আধুনিক সাহিত্যের উপর অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যিকদের কেহ এই সাহিত্যে পতিতোদ্ধারকে একটু অন্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা মানুষের স্বাভাবিক শ্লীলতা যে বৃত্তিটীকে চাপিয়া রাখিতে চায়, সাহিত্যে সেই বৃত্তিটীকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের নজীর এই যে আমরা যাহাকে পাশবিকবৃত্তি বলি তাহা মানুষের পক্ষে যাহা আমরা সুবৃত্তি বলি তাহার চেয়ে কোন ক্রমেই কম সত্য নহে। অতএব চরিত্র বিকাশের মধ্যে উভয়েরই স্থান হইতে পারে। এই আদর্শ নিয়া এমন অনেক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে সাহিত্য লক্ষ্মীর কমলবনে ভ্রমর গুঞ্জণের পরিবর্ত্তে কর্দ্দমছড়'ছড়ি ও বিকট চীৎকারই খুব বেশী। এই মতবাদী সাহিত্যিকরা ছাইগাদা হইতে রত্ন খুজিতে যাইয়া, উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান, কাঁদা ঘাঁটাই সার হয়। আধুনিক সাহিত্যের একটা বিশেষ লক্ষণ একটা বিরাট অতৃপ্তি, অসন্তোষ এবং দারুণ হাহাকার। এই pessimistic ভাব পূর্ব্বোক্ত ভাবটীর সহিত মিলিয়া এক অপরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছে। এই ধরণের সাহিত্যের মধ্যে যাহা আমাদের বেশী পীড়া দেয়, তাহা এই যে উহার প্রতি কথায় মানুষের পরাজয়ের কথাই মনে পড়ে। মানুষের গৌরব কি পরাজয়ে না জয়ে? সাংসারিক এবং মানসিক সংগ্রামে মানুষ কি নিয়তই পরাজিত হইতেছে? কখনই নহে। মানুষ কখনই এত অসহায় নহে। আধুনিক সাহিত্যের লাঞ্ছিত, অপমানিত, অসহায় নরনারী

আসিয়াছেন। সম্প্রতি পাশ্চাত্য সাহিত্যিকের নূতন আদর্শ আমদানি হওয়ায় এদেশে একটী নূতন দলের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা কলা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করাই সাহিত্যিকের একমাত্র উদ্দেশ্য এই মত প্রচার করিতেছেন। নরনারীর যৌন সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়াই তাহারা কলার বিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ইব্‌সেন ও বার্ণাডশর বঙ্গীয় শিষ্যগণ অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের সাহিত্যের আবহাওয়া কলুষিত ও পূতিগন্ধময় করিয়া তুলিয়াছেন। গুরু মন্ত্র উপলব্ধির অভাবে ও শক্তিহীনতার দোষে শিষ্যগণ এদেশে অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। এই গ্রন্থে লেখক অতিশয় দক্ষতার সহিত পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শের দোষগুণ বিচার করিয়াছেন। লেখক পাশ্চাত্য সাহিত্য বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিয়া মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্‌সেনের অনেক শিষ্যই গুরুর কোন পুস্তক পাঠ করেন নাই। তাঁহার নাম শুনিয়াই তাহার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং তরুণ সাহিত্যিকদিগকে এই পুস্তক-খানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি, পড়িলে উপকৃত হইবার আশা আছে। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল, ভাব প্রকাশ করিবার নৈপুণ্য ও বেশ আছে।

শোক সংবাদ।

আমরা গভীর শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে জানাইতেছি যে এ জেলার গৌরব নবাব নবাবআলি চৌধুরী সি, আই, ই, আর ইহ জগতে নাই। গত ৩রা বৈশাখ রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় দার্জ্জিলিং তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। নবাব সাহেব বঙ্গবাসীর একজন সাধক ছিলেন। তিনি "সৌরভের" একজন পৃষ্টপোষক ছিলেন। কিছুদিন হয় তিনি লিখিয়াছিলেন "আমি রাজনৈতিক কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার পর হইতে সাহিত্য সেবা ছুটীয়া গিয়াছে এবং আমার সময়ও নাই। যাহা হউক অবসর মত ভবিষ্যতে মাতৃভূমির গৌরব এবং আমার একান্ত আদরের "সৌরভে" প্রকাশার্থ প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইব।" হায় সে সাধ আর পূর্ণ হইল না। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

সাহিত্য সংবাদ।

২০শে বৈশাখ সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকার সময় স্থানীয় দুর্গা বাড়ীতে ময়মনসিংহ সাহিত্য সভার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আগামী সংখ্যায় তাঁহার অভিভাষণ "সৌরভে" প্রকাশিত হইবে।

বৈশাখ হইতে "আলিয়া" নামে একখানা মাসিক পত্র এই নগর হইতে বাহির হইতেছে। আমরা এই নবীন সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সৌরভের লেখক পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন কাব্যতীর্থ মহাশয় "দক্ষিণা" নামক ছেলেদের জন্য তিন অঙ্ক একখানা নাটক প্রকাশ করিয়াছেন।

সৌরভ-

স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর

বাহাদুর সি, আই, ই।

ঘন ঘন সংসদ বসিত। সমাজের হিতচিকীর্ষু মহাপুরুষেরা যেখানে সমবেত হইয়া সমাজ রক্ষার উপায় চিন্তা করিতেন—সমাজ হইতে পাপ ও অধর্ম্ম দূর করিতে চেষ্টা করিতেন এবং মানুষকে সৎপথে চালিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। মনে হয়, আজ আমাদের সাহিত্যের নৈমিষারণ্য সৃষ্টি করিবার সময় আসিয়াছে; অথবা লুপ্ত ও গুপ্ত তীর্থের মত কোথাও হয় ত তাহা বর্ত্তমান রহিয়াছে—সেটী আজ আমাদের উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে। যে জঞ্জাল ও আবর্জ্জনা আজ সাহিত্যকে কলুষিত করিয়া রহিয়াছে—তাহা দূর করিতে হইলে এমনি করিয়া পুত চিন্তার নৈমিষারণ্য সৃষ্টি করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই। শিল্পীদের শিল্পের দর কষিবার জন্য বিচারক গোষ্ঠী গঠন করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এই যে আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, মনে হয় এই খানেই তার একটা বড় সার্থকতা রহিয়াছে। আমাদের এই আরম্ভ শুভমণ্ডিত হউক, ইহাই আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

"সরস্বতী শ্রুতিমহতাং প্রবর্দ্ধতাং। *

যৌবন প্লাবন।

(১৫)

(অধ্যাপক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)

সেই যে কটক হইতে কতদিন আগে অরুন্ধতী এখানে আসিয়াছিলেন সেই আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জীবনের আনন্দ উৎস শুকাইয়া গিয়াছিল। যে অর্থ তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল, সেই অর্থ কিছুদিন পরেই নিঃশেষ হইয়া গেল। তারপর আসিল তাহার জীবনে একটা ভীষণ সংগ্রামের দিন। শিশু কন্যাটীকে লইয়া তাহাকে কতই না বিব্রত হইতে হইয়াছিল। দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া এই ক্ষুদ্র বাড়ী খানিতে দীর্ঘদিন কাটিয়া গিয়াছে। হরিচরণ কয়েক বৎসর অরুন্ধতীর এখানেই ছিল তারপর একবার দেশে যাইবার পরে আর ফিরিয়া আসে নাই। অরুন্ধতী যে তাহার রূপ ও যৌবনের অফুরন্ত আকর্ষণের মধ্যেও সমস্ত প্রলোভন ও অত্যাচারী পুরুষের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া আসিতে পারিয়াছিল তাহার মধ্যে ছিল তাঁহার নিজের অসাধারণ সংযম, পুরুষের প্রতি ঘৃণা এবং একজনের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসা।

অরুন্ধতী কলিকাতার এই জীবনটা এই বাড়ীতেই কাটাইয়া দিয়াছেন। কলিকাতা আসিবার কয়েকদিন পরে একদিন সে খবরের কাগজে দেখিতে পাইল যে বালিগঞ্জে একটী মহিলা শিক্ষামন্দির আছে, সেখানে অনাথা মেয়েদের অর্থোপার্জ্জন করিবার যোগ্যতালাভ করিবার মত শিক্ষা দেওয়া হয়। মিসেজ সি মুখার্জ্জি সেই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা।

অরুন্ধতী সাহসে ভর করিয়া একদিন তাঁহার সহিত দেখা করিতেই তিনি তাঁহাকে আনন্দে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া বলিলেন "তুমি যে আমার সাথে দেখা করতে এসেছ, এতে আমি বড়ই সুখী হয়েছি। বল মা কি তোমায় আমার করতে হবে?" অরুন্ধতী তখন সেই স্নেহময়ী নারীর মহত্ত্বের কাছে তার সর্ব্বপ্রকার অন্তরের বেদনার কথা প্রকাশ করিল সে মনে একটু সঙ্কোচ করিল না। বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল তাহার কণ্ঠ বেদনায় রুদ্ধ হইয়া গেল। যশোদা দেবী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া আনিলেন।

মিস্ জে সি মুখার্জ্জির বাঙ্গলা নাম যশোধা সুন্দরী। খুবই বড় লোকের একমাত্র মেয়ে। ছেলে বেলা যশোদাকে তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিয়া লেখা পড়া শিখাইয়া ছিলেন, কিন্তু যশোদার মন কিছুতেই বিবাহ করিয়া সংসারের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চাহিল না। ধনীর একমাত্র সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু যশোদা তাহার সমস্ত শক্তি নারী সমাজের কল্যাণের জন্য নিয়োজিত করিল। পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের সুবৃহৎ প্রাসাদ তুল্য বাড়ী হইল যত অনাথা সহায়হীনা বিধবা নারীর আশ্রয় ভবন। মিস্ মুখার্জ্জি বিলাত ও ইউরোপ আমেরিকার প্রত্যেকটী নারী প্রতিষ্ঠান দেখিয়া শুনিয়া সেখান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া দেশের কল্যাণ কার্য্যে তাহার দেহ মন প্রাণ সমর্পন করিয়াছিলেন। এখন তাহার বয়স হইয়াছে, একদল শিক্ষিতা নারীকেও তিনি এই কার্য্যের ভিতর টানিয়া আনিয়াছেন।

* সাহিত্য সভায় পঠিত।

প্রাচীন ভারতে আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল।

(অযোধ্যা—কিষ্কিন্ধ্যা—লঙ্কা।)

(৺কেদারনাথ মজুমদার)

রামায়ণ ভারতীয় আর্য্য ও অনার্য্য সভ্যতার বিরাট মানদণ্ড। আর্য্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমি অযোধ্যা; অনার্য্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কা। প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতার কেন্দ্রভূমি অযোধ্যা হইতে সেই সুদূর প্রাচীনতম যুগে যে জ্ঞান-গরিমা বিকীর্ণ হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে আজও ভারতবর্ষ জগতের জ্ঞান-গুরুরূপে পূজিত হইতেছে।

যে অযোধ্যা একদিন সভ্যতা ও জ্ঞান-গরিমার কেন্দ্রভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল, সেই আদি-সভ্যতার লীলা-নিকেতন অযোধ্যা কিরূপ সম্পদশালী ছিল, মহাকবি বাল্মীকি তাহা তাঁহার অমর তুলিকায় চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা সর্ব্বাগ্রে সেই চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া আমাদের সেই অতীত বিভব মানসনেত্রে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিব।

মহাকবি বাল্মীকি অযোধ্যার যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

"কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধনধান্যবান্॥ ৫
আযোধ্যা নাম নগরী তত্রাণীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ যা পুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্॥ ৬
আয়তা দশ চ দ্বে চ যোজনানি মহাপুরী।
শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্তমহাপথা॥ ৭
রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা।
মুক্তপুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেননিত্যশঃ॥ ৮
তাং তু রাজা দশরথো মহারাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ।
পুরীমাবাসয়ামাস দিবি দেবপতির্যথা॥ ৯
কপাটতোরণবতীং সুবিক্রান্তরাপণাম্।
সর্ব্বযন্ত্রায়ুধবতীমুষিতাং সর্ব্বশিল্পিভিঃ॥ ১০
সূতমাগধসম্বাধাং শ্রীমতীমাতুলপ্রভাম্।
উচ্চাটালধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্॥ ১১
বধূনাটকসঙ্ঘৈশ্চ সংযুক্তাং সর্ব্বতঃ পুরীম্।
উদ্যানাম্রবনোপেতাং মহতীং শালমেখলাম্॥ ১২
দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্।
বাজিবারণসম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা॥ ১৩
সামন্তরাজসঙ্ঘৈশ্চ বলিকর্ম্মভিরাবৃতাম্।
নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগ্ভিরুপশোভিতাম্। ১৪
প্রাসাদৈ রত্নবিকৃতৈঃ পর্ব্বতৈরিব শোভিতাম্।
কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণামিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্। ১৫
চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণাযুতাম্।
সর্ব্বরত্নসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্॥ ১৬
গৃহগাঢ়ামবিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্।
শালিতণ্ডুলসম্পূর্ণামিক্ষুকাণ্ডরসোদকাম্॥ ১৭
দুন্দুভীভির্মৃদঙ্গৈশ্চ বীণাভিঃ পণবৈস্তথা।
নাদিতাং ভৃশমত্যর্থং পৃথিব্যাং তামনুত্তমাম্॥ ১৮
বিমানমিব নিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি।
সুনিবেশিতবেশ্মান্তাং নরোত্তমসমাবৃতাম্॥ ১৯ *

(আদি—৫ম সর্গ।)

---

* উদ্ধৃত অংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ প্রদত্ত হইল—

"কোশল দেশে সরযূতীরে অযোধ্যা নগরী অবস্থিত। সেই নগরী বহু সুবিভক্ত রাজপথে সুশোভিত। রাজপথগুলি সর্ব্বদা সলিলসিক্ত ও প্রস্ফুটিত পুষ্পে বিকীর্ণ। এই সুদৃশ্য নগরী দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও ত্রিযোজন বিস্তৃত এবং বহু তোরণ ও কপাট-সমন্বিত। রাজপথগুলির উভয় পার্শ্ব পণ্য-পরিপূর্ণ আপণশ্রেণীতে পরিশোভিত। স্থানে স্থানে যন্ত্র ও অস্ত্রসমূহ শোভিত। কোন স্থলে শিল্পিগণের বাসস্থান। উন্নত-প্রাকার-শীর্ষে ধ্বজাবলি বায়ুবেগে উড্ডীন হইতেছে; প্রাকারের উন্নত স্থানে শত শত শতঘ্নী (কামান) স্থাপিত। নগরের স্থানে স্থানে উদ্যান ও আম্রকানন—তাহার চতুর্দ্দিকে সুবিন্যস্ত শালবৃক্ষশ্রেণী শোভিত। স্থানে স্থানে বধূদিগের নাট্যশালা। নগর চতুর্দ্দিকে গভীর-জল-পরিপূর্ণ-দুর্গ-পরিখা-বেষ্টিত সুতরাং দুর্গম এবং শত্রুরক্ষিত।

"নগরীর কোন স্থানে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, গো, গর্দ্দভ, প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে। কোন স্থানে সামন্ত রাজগণের বাসভবন। কোন স্থানে বিভিন্নদেশবাসী বণিক্‌সম্প্রদায় বাস করিতেছেন। কোথাও রত্ন-প্রাসাদ সমূহ অত্যুচ্চ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোথায়ও সূত ও মাগধগণ বাস করিতেছে। কোথায় বা বিহারার্থ গুপ্তগৃহ ও সপ্ততল গৃহরাজি অবস্থিত।

"নগরী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ধনধান্য-পরিপূরিতা এবং ইক্ষুরসতুল্য সুস্বাদু-পানীয়-জল-শালিনী। চতুর্দ্দিকে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পবণ-সমূহ ধ্বনিত হইতেছে। ইত্যাদি

এই অমরাবতীতুল্যা অযোধ্যাই প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি।

মহাকবির এই বর্ণনা হইতে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ অনুভূত হইবে। প্রাচীন ভারতের সেই বিশাল রাজধানীর দৈর্ঘ্য ৯৬ মাইল ও প্রস্থ ২৪ মাইল ছিল।* ইহার পরিমাণ ফল বর্ত্তমান সময়ের একটি বৃহৎ জিলার সমান। এই রাজধানী দুর্গম দুর্গ ও জলপূর্ণ সুগভীর পরিখা-বেষ্টিত ছিল।

অযোধ্যার কতখানি স্থান প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল, রামায়ণের উপর্য্যুক্ত বর্ণনা হইতে তাহা নিশ্চিত অবগত হওয়া যায় না।

আদিকাণ্ডের ৬ষ্ঠ সর্গের—

"সা যোজনে দ্বে চ ভূয়ঃ সত্যনামা প্রকাশতে।"

—শ্লোক হইতে দুই যোজন পরিমাণ স্থানই প্রকৃত অযোধ্যা বলিয়া পরিচিত ছিল, ইহা অবগত হওয়া যায়। এই দুই যোজন স্থানই সম্ভবতঃ দুর্গম পরিখায় ও প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল।

এই প্রাচীর কি উপকরণে নির্ম্মিত ছিল, রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই। তৎকালে প্রস্তরের ও ইষ্টকের প্রচুর ব্যবহার ছিল, তাহা উপর্য্যুক্ত বর্ণনা হইতেও জানা যায়; সুতরাং ঐ দুই সামগ্রীর সমন্বয়ে বা ইহার কোন একটির দ্বারা যে এই সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীর নির্ম্মিত ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ‡

এই প্রাচীরের উর্দ্ধ দেশে স্থানে স্থানে শতঘ্নী অস্ত্র সমূহ (কামান) * স্থাপিত থাকিত। দুর্গরক্ষার্থ আধুনিক কালেও এইরূপ প্রণালীতে কামান রক্ষিত হইয়া থাকে।

রাজধানী "কবাট ও তোরণবতী" ছিল। রাজধানীর কয়টি বহির্দ্বার ছিল, তাহার উল্লেখ রামায়ণে নাই। গ্রন্থের

---

* মুসলমান ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আইন-ই' আকবরিতে আযোধ্যার প্রাচীন রাজধানী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ইংরাজি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"In ancient times city is said to have measured 148 coss in length and 36 coss in breadth. Upon shifting the earth which is round this City small grains of gold are sometimes found in it. The town is esteemed one of the most sacred places in antiqu ty."—H. Blockman

† ঐতিহাসিক হুইলার তাঁহার History of India (Ramayana) গ্রন্থে অযোধ্যার প্রাচীন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"His (Dasarath's) palace was magnificent and resplendent, but in discribing the walls the Brahmanical bard has indulged in a simile which furnishes a glimpse of the reality. They were so tall that the birds could not fly over them and so strong that no beast could force its way through them. From this it is evident that the walls could not have been made of brick or stone; for in that case the attempt of a beast to force his way through them would never have entered the mind of the bard. In all probbability the palace was surrounded by a hedge which was sufficiently strong to keep out wild beasts or stray cattle."—অর্থাৎ "দশরথের রাজপ্রাসাদ সমৃদ্ধিশালী ছিল, কিন্তু পুরীর প্রাচীর বর্ণনায় কবি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রকৃত সত্যের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। (কবি লিখিয়াছেন) "প্রাচীরগুলি এত উচ্চ ছিল, যে পক্ষী তাহার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে পারিত না, এবং এত দৃঢ় ছিল যে কোন পশুই তাহার ভিতর দিয়া পথ করিয়া যাইতে পারিত না।" কবির এই উক্তি হইতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, অযোধ্যার এই প্রাচীর কখনই ইষ্টক কিম্বা প্রস্তরের নির্ম্মিত ছিল না। যদি তাহা হইত, তবে পশু ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া যাইবার অলীক কল্পনা কখনই কবির মনে প্রবেশ করিত না। যাহা হউক, সম্ভবতঃ অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ বংশবৃতি বেষ্টিত ছিল—অবশ্য খুব মজবুত বেড়া ছিল—তাহা ভাঙ্গিয়া কোন প্রকারের পশুই রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিত না।

হুইলারের রামায়ণ-জ্ঞান ভ্রান্তিসঙ্কুল; সুতরাং তাঁহার সিদ্ধান্ত নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। তিনি স্বয়ং সংস্কৃত জানিতেন না। অবিনাশচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট রামায়ণ ও মহাভারত শ্রবণ করিয়া উক্ত গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে কিরূপে রামায়ণ হইতে এই সকল উদ্ভট তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। প্রাচীর এত উচ্চ ছিল যে, পক্ষী তাহার উপর দিয়া উড়িতে পারিত না, এত দৃঢ় ছিল যে, বন্য পশু ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া যাইতে পারিত না। এই সকল উদ্ভট তত্ত্ব আমরা মহাকবির বর্ণনায় দেখিতে পাইতেছি না। আর্য্য রামায়ণে প্রাচীরের উল্লেখই অতি অস্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে; "উচ্চাট্টাল-ধ্বজবতীং শতঘ্নীশতসঙ্কুলাম্।" এই শ্লোক হইতে রামায়ণের টীকাকার রামানুজ প্রাকারের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রামায়ণের আর কোন স্থানে অযোধ্যার প্রাকারের উল্লেখ নাই। দুর্গ-পরিখার উল্লেখে লিখিত আছে "দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্।"

* শতঘ্নী—যাহাদ্বারা শত সংখ্যক জীব একেবারে নিহত বা আহত হয় এইরূপ অস্ত্র। ইহা আধুনিক কামান না হইলেও কোনরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী সঙ্গত কামান জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র ইহাতে সন্দেহ নাই।

না! যে জিনিষ শব্দ গর্জ্জনে আপনাকে প্রকাশ করে, তা' সুধু সকলকে সাবধান করে দেয়! সুধু মাত্র রেখা পাতে, অন্তরের শিরা উপশিরায়, সুকুমার হিল্লোলে, যা মৃদু কম্পন জাগিয়ে তোলে, সেটাই বুকে অধিক দাগ বসিয়ে যায়! প্রেম বল, ভালবাসা বল, এমন একটা কিছু আকাঙ্ক্ষার শত-ধারায় মথিত হয়ে যখন অন্তরে জেগে উঠেছে, তখন তাকে কৌস্তভ মণির নয়ন ভোলান আলোর মতই আকড়ে ধরে থাক্‌ব, এ অধিকার সহজে ত ছাড়া যাবে না! ভালবাসা তুচ্ছ নহে! সেও সাধনা, অশ্রুজল সাপেক্ষ, তাতে নিষ্ঠুরতার আঘাত নেই, কিন্তু বজ্রের কঠোরতা রয়েছে! স্মৃতির অনল তুমি সামান্য বলে উড়িয়ে দিতে চাইছ? তুমি যদি আমার অন্তরের ভিতরকার সন্ধান নিতে পার্‌তে,—তবে দেখতে, কত বড় একটা পবিত্র তন্ময়ত্বে আমার অন্তর অধিকৃত হয়ে আছে! তার নিকট সুখ ঐশ্বর্য্যের মোহময় প্রলোভন, কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ! অমত প্রকাশ কর্‌লে তোমার জীবন নষ্ট হবে, সেই একমাত্র আশঙ্কায় অস্থির হয়ে পড়েছি। যদি তোমাকে রক্ষা কর্ত্তে পাত্তুম, তবে দেখিয়ে দিতুম, ভালবাসার তন্ময়ত্বের নিকট, মৃত্যুর দংশন ভীতি, কত সামান্য, কত তুচ্ছ! যে দিন এ ভাবের সুতো কাটার পালা শেষ হয়ে যাবে, সে দিন যেন পর পারে যাত্রার জন্য বিন্দু দ্বিধার সঞ্চারও না হয়, এই আশীর্ব্বাদই তুমি——।" কথা শেষ না হইতেই মতিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহাদের কক্ষের দ্বার উন্মোচন করিয়া স্বয়ং বাদসা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সক্রোধ কটাক্ষে, ভ্রূকুটি বদ্ধ আরক্ত মুখে, একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেন শত তীব্র জ্যোতিতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতে ছিল! সেই দীপ্তি যেন তাহাদের উভয়কে দগ্ধ করিয়া পোড়াইবার জন্য শিখা বিস্তার করিতেছিল!

আকস্মিক আঘাত প্রাপ্তের ন্যায়, উভয়ে চমকিয়া উঠিল। উভয়ের মুখে ভূতাহতের মত আতঙ্কের চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল। মতিয়া আলুথালু বেশে ছুটিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। হোসেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায়, নত মস্তকে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। উভয়ের দেহই একটা আকস্মিক বিপদের আশঙ্কায় থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল!

(ক্রমশঃ)

ভবিষ্যতের সমাজ

(শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত এম্, এ, বি, এল্,)

অতি প্রাচীন কালে জগতের স্থানে স্থানে নানা সময়ে মহিমান্বিত যে সকল জাতির অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই প্রবীণ মিশর, প্রাচীন বেবিলন, প্রাচীন এসিরিয়া বাসিদের বংশ-ধরগণের অস্তিত্বও এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোথায়ই বা গেল পরবর্ত্তীকালে আবির্ভূত সুশিক্ষিত সৌন্দর্য্য ও বলের উপাসক শৌর্য্যবীর্য্যশালী স্বদেশপ্রাণ প্রাচীন গ্রীক জাতি, কোথায় মহাপরাক্রমশালী রোমান জাতি, তাহাদের প্রবর্ত্তিত সমাজ, সভ্যতা? প্রাচীন ফিনিসিয়া, কার্থেজ কোথায়? কোথায় সব? এখন সে সকল প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

কেবলমাত্র পূর্ব্বকালের দুইটী জাতি এখনো যদিচ নিতান্ত দীনাবস্থায় তাহাদের বহুকালের প্রথা ও জীবন-নীতি, চালচলন, সমাজ ও সভ্যতা অটুট্ রাখিয়া বিরাজ করিতেছে—প্রাচীন চীন ও প্রাচীন হিন্দুজাতি। চীনের কথা বলিবার দরকার নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেল, আফ্রিকা, ইয়ুরোপ ও এশিয়ার নানাস্থানে কত সাম্রাজ্য ও সভ্যতা আবির্ভূত হইয়া অবশেষে আকাশে শব্দের মত বিলীন হইয়া গেল। খাইবার ও বোলান গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া জল স্রোতের মত দুর্ব্বার বেগে প্রবেশ করিয়া শক্, ও হুন্, গ্রীক, পাঠান, মোগল প্রভৃতি কত সময় কত জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়া তাহাদের বলবিক্রমে ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানিতে তাহার শান্তিময় বক্ষ তোলপাড় করিয়া তুলিল। মুসলমান ও হিন্দুতে ছয় শত বর্ষেরও অধিক কাল সংঘর্ষ চলিয়া ছিল; জ্ঞানালোচনা তৎপর বৃদ্ধের সঙ্গে নব বলদৃপ্ত অশিক্ষিত যুবকের সংগ্রাম—প্রথম ধাক্কায় বৃদ্ধের পড়িয়া যাইয়া মৃতপ্রায় অবস্থায় ধরাশায়ী হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, বৃদ্ধ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং যুবকই পিছাইয়া যাইতেছে, শেষে এমন অবস্থাও আসিয়া দেখা দিল যে সে বৃদ্ধেরই পদানত হইবার উপক্রম। এই সন্ধি স্থলে আর এক নূতন যুবক-জাতি আসিয়া সমরাঙ্গনে আবির্ভূত হইল; তাহা না হইলে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে ভারতবর্ষে

আবার হিন্দুরাজত্বে ও হিন্দু সভ্যতার অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী ছিল, এবং ইহাও খুব সম্ভব হয়তো ইসলাম কালে তাহাদের কলেবরভুক্ত হইয়া নিজ অস্তিত্ব লোপ করিতে বাধ্য হইত।

(২)

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ ভারত ইতিহাসের মহাস্মরণীয় বৎসর। সেই সময় ইংরাজ ভারতবর্ষের রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করে এবং তাহার পর হইতে প্রায় দুই শত বৎসর কাল ভারতবাসীর ভাগ্যনিয়ন্তারূপে অবস্থান করিতেছে। বয়সে হিন্দু অপেক্ষা কত ছোট, কিন্তু তাহার বিক্রমে বুদ্ধিমত্তায় শুধু ভারতবর্ষ নয়, জগতের চতুর্থ ভাগের অপেক্ষাও অধিকাংশ স্থান তাহার পদানত। দেখিয়া মনে হয়, বর্ষাকালে পূর্ব্ববঙ্গের খাল নদীতে সচরাচর দৃষ্ট ছোট ছোট ষ্টীম-লঞ্চের পিছনে বাঁধা মস্ত মস্ত বোঝাই করা পাটের নৌকার মত বিশালবপু ভারতবর্ষকে যেন সে হিড় হিড় করিয়া পশ্চাতে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে।

মুসলমান ও ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারত বিজয়—উভয়ের মধ্যে অগাধ পার্থক্য। মুসলমান যাহা করিয়াছিল, তাহা প্রায় একপ্রকার গায়ের জোরে—হিন্দুর মনের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে সে পারে নাই। কালে মুসলমান পাঠান মোগল সম্রাট দেশ প্রচলিত প্রাচীন রীতিনীতি ভাষা ভাব অনেকাংশে অলক্ষিতে গ্রহণ করিয়া ভারতবাসী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং অর্দ্ধশিক্ষিত লোকোচিত বাইরের জাঁক-জমক লইয়াই মজিয়া রহিয়াছিল। আগ্রার তাজমহল ও দিল্লীর দেওয়ানি আম, দেওয়ানি খাস, স্বর্ণের ময়ূর সিংহাসন প্রভৃতি অতুল্য অট্টালিকা ও সামগ্রীতেই সে সাম্রাজ্যের চরম পরিণতি দৃষ্ট হয়। মোগল কি পাঠান বাদশাহদের জ্ঞান চর্চ্চার দিকে কখনও তেমন প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই—সমস্ত দেশ তখন এক নিরবচ্ছিন্ন অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়া ছিল। এক সময় অবশ্য অন্যত্র—ভারতে নয় মুসলমানদের মধ্যেও প্রভূত জ্ঞানের চর্চ্চা হইয়াছিল, কিন্তু ভারতে তাহাদের পক্ষে ঐ জিনিষটা যেন এ পর্য্যন্ত তেমন ধাতে সহিয়াও সহে নাই। নালন্দা, তক্ষশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় যে জাতির জ্ঞানালোচনার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিরাজমান থাকিয়া জগতের নানাস্থানের লোককে জ্ঞান আহরণের জন্য যুগে যুগে আকর্ষণ করিয়াছিল—মুসলমানের সংঘর্ষে আসিয়া সে জাতির কি দুর্দ্দশাই না উপস্থিত হইয়াছিল! প্রদীপ্ত আলোর দিকে ধাবমান মক্ষীকার ন্যায় পূর্ব্বাপর হিন্দুর প্রাণ জ্ঞানের দিকে বদ্ধদৃষ্টি, অমৃত অভিলাষী হিন্দু আত্মা এই জ্ঞানাভৃত লাভের আশায় পূর্ব্বাপর কি তপস্যাই না করিয়াছে! জ্ঞান ও ধর্ম্মে হিন্দুর পার্থক্য নাই,—শ্রেষ্ঠ জ্ঞানই, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই জ্ঞানামৃত সংগ্রহের জন্য স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া সে বিষয় বিরাগী সন্যাসী সাজিয়াছে—জ্ঞান যোগী বাল্মীকি, ব্যাস, জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য কোথায় তুলনা ইঁহাদের? মুসলমান যুগে নানাদিক হইতে এই জ্ঞানার্জ্জনের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল, তাও প্রাচীন শাস্ত্র ও তলপি, তল্পা নাড়িয়া চাড়িয়া নিংড়াইয়া যে কিছু জ্ঞানরস সে পান করিতেছিল, তাহারই কল্যাণে পুষ্ট হইয়া হিন্দু মরিয়া ও মরিল না। জ্ঞানের সম্মুখে অজ্ঞানতা, আলোর সম্মুখে আঁধার কতদিন অজ্ঞানতা গর্ব্বভরে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? জ্ঞানের অভাবেই মুসলমান হিন্দুর নিকট অবশেষে পরাস্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল!

(৩)

কিন্তু ইংরাজ যেমন বাইরের, তেমন জ্ঞানের বলে বলীয়ান্, যেমন শক্তি; তেমন তাহার বুদ্ধি! জগৎজয়ী দুর্দ্ধর্ষ, মহাশিক্ষিত ইংরাজ জাতি! প্রথম অবস্থায়, বাহির ও ভিতর, দেহ ও মন—সর্বদিক হইতেই সে হিন্দুকে পূর্ণরূপে পরাভূত করিবার উপক্রম করিয়া তুলিয়াছিল! কিন্তু এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, তাহার বিশ্ববিজয়-ব্যাপারও ভারতবর্ষে চরম সীমায় উপনীত হইয়া প্রাচীন বৃদ্ধের সংঘর্ষে আসিয়া শেষ দশায় উপস্থিত হইয়াছে; ধীরে ধীরে ভারত তাহার নিজ কেন্দ্রে আসিয়া দাঁড়াইতেছে ও ইংরাজী সভ্যতা তাহার ধাক্কায় হটিয়া যাইতেছে—ভারতের সভ্যতা ইংরাজী সভ্যতাকে উদরস্থ করিয়া নিজ অঙ্গীভূত করিতেছে ও নিজ অন্তর্নিহিত বেগে বিকশিত হইতেছে, ইংরাজ ভারতে ভারত কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য প্রভাব জয়ের সূচনা দেখা দিয়াছে। এমনও দিন গিয়াছে, যখন লর্ড মেকলের দাম্ভিকতাপূর্ণ ঘৃণা তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক উক্তি A shelf of good European Library is worth the whole literature of India and Arabia ইয়ুরোপের কোনও শ্রেষ্ঠ পাঠাগারের এক তাক্ বই, গুণে ভারতবর্ষ ও আরবের

সমস্ত সাহিত্যের সমকক্ষ—ভারতবাসী মহাসভ্যস্বরূপে গ্রহণ করিয়া নিজেদের নিতান্তই অপদার্থ ও হীন মনে করিয়াছে। ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের শিক্ষা, আচার, রীতি-নীতির প্রশংসায় এ দেশবাসী তখন পঞ্চমুখ ছিল। দেশের কবি তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার বাইরের তীব্র আলোকে চমক-লাগা চোখে পথ বিপথ ভুলিয়া সেক্সপিয়ারকে জগতের ও কালিদাসকে কেবলমাত্র ভারতের কবিস্বরূপে সম্বোধন করিয়া দেশবাসির নিকট সুতীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধির জন্য মহা-প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মহাকবি কালিদাসের তুলনায় সেক্সপিয়ার? কি আছে এমন সেক্সপিয়ারে, যাহা অনন্ত অভিলাষী মানবের আত্মার আকাঙ্ক্ষার খোরাক জুটাইতে পারে? কোথায় বা তুলনা মহাকবি ভবভূতির? মহাকবি বিদ্যাপতির সমকক্ষ কোথায়? কোথায় পাণিনির? ষড়দর্শনের? শকুন্তলার, রামায়ণ মহভারতের? উপনিষদ ও বুদ্ধবাণীর? জ্ঞানবৃদ্ধ ভারতের তুলনায় ইংল্যাণ্ড! স্যার উলিয়াম জোন্‌স, ম্যাক্সমুলার, বেণ্টলি, কোলব্রুক, ফারগুসন্, হেভেল, স্মিথ প্রভৃতির গবেষণার, কল্যাণে চোখের ধাঁধা, মনের ধাঁধা ভারতবাসীর অনেকটা গিয়াছে। বুঝিতে পারিতেছে সে একা পরিষ্কাররূপে জ্ঞানরাজ্যে জগতে তাহার দানের মূল্য কম নয়, এবং মোটের উপর ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতিতে অভ্যুত্থিত নবীন জাতি সমূহ তাহার সঙ্গে তুলনায় কত নীচে। কার্য্যক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে, যেখানে ভারতবাসী সুযোগ সুবিধা পাইতেছে, সকলকে ডিঙ্গাইয়া সর্ব্বাগ্রে সে স্থান গ্রহণ করিতেছে। এমন পতিত অবস্থাতেও যে জাতির মধ্যে রামমোহন, জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও মধুসূদনের মত মনীষীগণের আবির্ভাব হইতেছে কোন্ দেশের তুলনায় সে দেশ নিকৃষ্ট মনে হইবে?

(৩)

মুসলমান যেমন তাহার ইসলাম ধর্ম্ম লইয়া হাজির হইয়াছিল, ইংরাজ ও তেমন তাহার সঙ্গে খ্রীষ্টধর্ম্ম আনিয়াছিল। প্রথম প্রথম রাজানুগৃহীত নবালোকদীপ্ত জগৎজয়ী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য জাতির গৃহীত ধর্ম্মস্বরূপে তাহা এ দেশবাসীর দৃষ্টি বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়াছিল। কত লোক পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের পতাকা তলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু যে শান্তি, সুখ, আনন্দের জন্য তাহারা দৌড়াইয়া গিয়াছিল, প্রাণের যে ক্ষুধা মিটাইবার জন্য বাইবেলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, বাইবেলে তাহা তাহারা পায় নাই। ফলে, তাহাদের বংশধরগণ মধ্যে কতজন আজ প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের বক্ষের মধ্যে পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে! ইহার কারণ যথেষ্ট রহিয়াছে। হিন্দু ধর্ম্ম মূলতঃ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, দর্শন ও ধর্ম্মে হিন্দুর চক্ষে কোনও পার্থক্য নাই পক্ষান্তরে খ্রীষ্টধর্ম্ম বা ইসলাম, যতটা না জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ততটা গোঁড়ামির উপর। গোঁড়া খ্রীষ্টান ব্যতীত এই বিজ্ঞানের যুগে কে বিশ্বাস করিবে, এক ধীবর পুত্র দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে জেরুজেলামে ক্রুশে আবদ্ধ অবস্থায় প্রাণ হারাইয়া সমস্ত মানবজাতিকে চিরকালের জন্য ত্রাণ করিয়া গিয়াছেন? গোঁড়া মুসলমান ছাড়া কে বিশ্বাস করিবে গেব্রিয়াল নামক স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব ও মহম্মদের সঙ্গে তাহার জল্পনা কল্পনা? গোঁড়ামীই এ সব কল্পনার ভিত্তি, কিন্তু তাহা ত্যাগ করার উপায় নাই; তাহা হইলে ধর্ম্ম যে থাকে না; নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদর্শিত পথে চলা—কয়জনের সাহস আছে তেমন? খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দর্শনের একবারেই স্থান নাই, ইসলামেরও তদ্রূপ। ইসলামের কিন্তু একটী বড় গুণ আছে সমদর্শিতা, ভ্রাতৃত্বের ভাব, জাতবিচার শূন্যতা। এই গুণে আকৃষ্ট হইয়াও সমগ্র সমগ্র মুসলমানের কাছে পরাস্ত হইয়া অনেক হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইংরাজ ভারতে প্রচারিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের এ সবেরই অভাব, তাই ইহা চলিল না; দর্শনে পুষ্ট তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি হিন্দুর চক্ষে বাইবেল বা কোরাণের কোন মূল্য নাই—দুইই দুটা নিরক্ষর লোকের মনোকল্পিত উক্তির সমষ্টি। জ্ঞানান্বেষী হিন্দু তাহাদের অনুসরণ করিবে কেন?

কিন্তু ইংরেজ তাহার জ্ঞান-ভাণ্ডারের শুধু বাইবেল গ্রন্থ লইয়াই এদেশে উপস্থিত হয় নাই। বাইরের কামান, বন্দুক অস্ত্রশস্ত্র ও বাইবেলের সহিত সে আর একটী জিনিষ সঙ্গে আনিয়াছিল—একটী মহাবিস্ফোরক যাহার নাম পাশ্চাত্যদেশে প্রবর্ত্তিত বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের আক্রমণে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখা দিন দিনই কঠিন হইয়া উঠিতেছে

সে পত্রের অপেক্ষা না করিয়া আপনি কল্যই তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বহু কৃতজ্ঞতা পূর্ণ ধন্যবাদ জানাইবেন। ময়মনসিং যে আমার প্রতি এত অনুকূল ইহার মুখ্য কারণ আপনি। বাবু ব্রজনাথ বিশ্বাস আপনাদের পরিষদের সভ্য কি? এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য আপনাকে পরে জানাইব।

আপনাদিগের একটি শব্দ কমিটী গঠন করা উচিত; ঐরূপ কমিটী গঠিত হইলে আমি তাহার Corresponding member হইতে প্রস্তুত আছি। কলিকাতার মূল পরিষদ আমাকে বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া বহুদিন হইতে সম্মান করিয়া আসিতেছেন। আপনারাও আমাকে বিশিষ্ট কিংবা শিষ্ট এইরূপ কোন একটা সভ্য করিতে পারেন।

বাঙ্গালা ভাষার বহু প্রচলিত শব্দ অভাগ্য পূর্ব্ববঙ্গের সৃষ্টি। ইহা আপনারা জানেন কি? যখন Self Government প্রচলিত হয়, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন স্বতন্ত্র শাসন, বঙ্কিম বলিলেন আত্মশাসন, পূর্ব্ববঙ্গের এক বৃদ্ধ বলিল স্বায়ত্ত শাসন। বহু বাদানুবাদের পর পূর্ব্ববঙ্গের অনুকূলেই ডিক্রি হইল; এবং গবর্ণমেণ্ট স্বায়ত্ত শাসন শব্দ গ্রহণ করিলেন। সহানুভূতি, বিরাট সভা, বাত কুক্কুট (weather cock) প্রভৃতি বহু শব্দই পূর্ব্ববঙ্গের। অল্প দিন হইল, এক সাহিত্যিক সাহেব এক পাণ্ডত লইয়া ঢাকা আসিয়াছিলেন এবং "Alphabetical Chart," "Kinder Garten" প্রভৃতি শব্দ লইয়া বিশেষ জিজ্ঞাসু হন। তাঁহাকে বলা হইল। প্রথমটির বাঙ্গালা নাম "বর্ণপট", ২য় টির বাঙ্গালা নাম "কুমার কানন" তিনি এই দুই নূতন শব্দই পাইয়া শতমুখে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং ঐ দুই শব্দই পুস্তকের নামে ব্যবহার করিবেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। গ্রন্থ পত্রে গবেষণা করিলে এইরূপ শত শব্দ পূর্ব্ববঙ্গের সৃষ্টি বলিয়া ধরা পড়িবে।

আমি এখন চলনমুখ। আপনারা দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব রক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন করুন ইহা আমার প্রার্থনা। ভগবানের কৃপায় আপনার মঙ্গল হউক।

আশীর্ব্বাদক—শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ

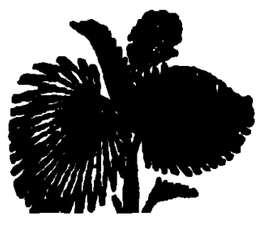

পাওয়া-নাপাওয়া

শ্রীনির্ম্মলেন্দু দত্ত মজুমদার।

নিউ মার্কেটে ছোট ভাই বোনদের জন্য উপহারের জিনিষ কিনিতে কিনিতে, সুবীরের দৃষ্টি পড়িল ওই ধারের ভদ্রলোকের সঙ্গের কিশোরীটির উপর মেয়েটিকে তাহার বেশ পছন্দ হইল। সুন্দর কোন কিছু পাইলে সকলেরই সাধ হয়। সুবীর ভাবিল, এই মেয়েটিকে পাইলে তাহার জীবন সার্থক হয়!

সুবীরের সব জিনিস কিনা হইয়া গেল; তবুও সে ঝাসায় ফিরিবার চেষ্টা করিল না।

কিছুক্ষণ পরে সেই ভদ্রলোক মেয়েটির হাত ধরিয়া একখানা কারে উঠিয়া বসিলেন। ড্রাইভার তাড়াতাড়ি হর্ণ টিপিয়া স্টার্ট দিল। সুবীর হতাশভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিল—হঠাৎ পকেট হইতে নোটবই বাহির করিয়া কারখানার নম্বর টুকিয়া লইল।

* * * *

দাদার ঘরে প্রবেশ করিয়া সুবীর বলিল, "আমি এখন বাড়ী যাবনা, তুমি একাই যাও দাদা।"

"বন্ধ হয়ে গেল, তবু বাড়ী যাবিনা কেনরে?"

বেশ গম্ভীরভাবে সুবীর বলিল, "এই—পরীক্ষার বছর, এখন যে কয়দিন এখানে থাকা যায়, তাই লাভ। পূজোর একদিন আগে গেলেইতো যথেষ্ট।'

"হাইকোর্ট কবে বন্ধ হয়ে গেল! শুধু তোর জন্যেই এদ্দিন অপেক্ষা করেছি; আর এখন হঠাৎ বলিস্ কি না যাবি না! না, সে আর এখন হয় না। বরং পূজোর পরই এসে পরিস্।'

সুবীর ভাবিতেছিল, সেই নম্বর নিয়া মেয়েটীর খোঁজ করিবে। কিন্তু যত গোল বাধাইল তাহার দাদা সুধীর। সে দাদাকে একটু ভয় করিত, কাজেই দ্বিরুক্তি করিতে আর সাহস পাইল না।

* * * *

শয়নকক্ষে একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া চৌধুরী মহাশয় বেশ নিশ্চিন্ত মনে গড়-গড়ার নলটা টানিতেছেন। এমন সময় হাসিমুখে আসিয়া স্ত্রী বলিলেন, "একটা কথা আছে।"

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

কুন্তলীন প্রেস,

এবং এখনও হইতেছে। মিথ্যা প্রচারিত হইয়াছে পুরুষ স্ত্রীর দেবতা, শুধু ইহকালের জন্য নয়, পরকালের জন্যও তাহার ভাগ্যনিয়ন্তা। পরকাল কি আছে? এখন কিন্তু দেখা যাইতেছে সবই মিথ্যা। স্ত্রীলোক বিষয়বিশেষে পুরুষ অপেক্ষা তুলনায় নিম্নস্থানীয় হইলেও আবার কোন কোনও বিষয়ে শ্রেষ্ট; অধিকতর দীর্ঘজীবী যে, তাহার দেহ পুরুষের তুলনায় তেমন অল্পে ভঙ্গুর নয়, বুদ্ধিবৃত্তি সুতীক্ষ্ণ, এবং মনের দৃঢ়তাও তাহার অধিক। তাহার দুর্ভাগ্য তাহার দৈহিক দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া পুরুষ তাহাকে আপনভাবে বাড়িতে দেয় নাই। বিশেষ করিয়া, এই ভারতবর্ষে সতীত্বরূপ এক তরোয়াল সব সময় তাহার মাথার উপর ধরিয়া রাখিয়া স্ত্রীজীবন পূর্ব্বাপর মহা কষ্টকর ও অশান্তিদায়ক করিয়া রাখা হইয়াছে। পুরুষের সুখসম্ভোগের, সুবিধার জন্যই সতীত্ব ধর্ম্ম তাহাকে বজায় রাখিতে হইবে, এবং এই মহাধর্ম্ম রক্ষা করাইবার জন্য তাহাকে নিরক্ষর বন্দিনীতে পরিণত করা হইয়াছে। সে জ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত, সে বাইরের সূর্য্যালোক ও বায়ু—বনের পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলেরই যাহা উপভোগ্য—হইতে বঞ্চিত, সে অসূর্য্যম্পশ্যা। রুদ্ধ গৃহে স্বামীর কাদামাখা পায়ের ধোয়া জল খাইয়া, তাহার ভোগবিলাসের পুতুলস্বরূপে পরিণত হইয়া, স্বামীর পুত্রকন্যাগণকে প্রতিপালন করিয়া, স্বামীর সংসার চালাইয়া বৃদ্ধকালে স্বামীর পায় মাথা রাখিয়া মরিতে পারিলেই তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি, তাহার নারীজীবনের পূর্ণতা। লেখাপড়ার তাহার দরকার নাই, জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। কি পার্থক্য এ জীবনের সঙ্গে পশুজীবনের? কি বিকট বিসদৃশ আদর্শ! কিন্তু ইহাই ভারতের শাস্ত্রকারদের, বড় বড় মুণি ঋষিদের ব্যবস্থা যাঁহাদের বিরুদ্ধে মুখ ফুটিয়া কথা বলিতেও ভারতবাসী সন্ত্রস্ত, কোনও অবস্থাতেই নারীর স্বাধীনতা নাই। পৃথিবী ভরা এত স্ত্রীলোক, সংখ্যায় তাহারা পুরুষ অপেক্ষা কম নয়, অথচ পুরুষের অত্যাচারে, প্রতিবন্ধকতায় সন্তানের জন্মদান ব্যতীত অন্য কোনও ব্যাপারেই তাহারা কিছুই করিতে পারে নাই। যেন শুধু সন্তানের মা হওয়াতেই নারী জীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা। মনুষ্য হিসাবে সন্তানের বাপ হওয়া ছাড়া আরও অনেক জিনিষ করিবার রহিয়াছে পুরুষের, এ সত্য সকলেই বোঝে, কিন্তু স্ত্রীলোকদের বেলাতেই বিপরীত বুদ্ধি আসিয়া দেখা দেয়। মাঝে মাঝে অগাধ আঁধারের ভিতর আলোককণার ন্যায় নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও এখানে সেখানে দুই একটী মাত্র রমণীর দিব্য প্রতিভা ফুটিয়া উঠিতেছে অথচ তাহাদেরই বংশধর ম্যাডাম্ কুরি, জর্জ্জ স্যাণ্ড, ম্যাডাম্ ডি ষ্টেইল, জর্জ্জ ইলিয়াট্, অহল্যাবাই, এ্যানি বেসেণ্ট! কি অপার শক্তি প্রতিভা সর্ব্বত্র, বিশেষ করিয়া এই ভারতভূমিতে, যুগ যুগ ধরিয়া পুরুষের অত্যাচারে বিনষ্ট হইতেছে! এই ব্যবস্থা, এই নারীদলন-ব্যাপার আর কতদিন চলিবে? সতীত্ব যজ্ঞে আর কতকাল স্ত্রীলোকের শক্তি সামর্থ বুদ্ধি ভস্মীভূত হইবে? পুরুষের সৎ হইবার দরকার নাই, হইলে ভাল, না হইলেও ক্ষতি নাই, যত সব ধর্ম্মের কঠোর ব্যবস্থা সহায়-বিহীনা স্ত্রীলোকের জন্য। সর্ব্বত্রই, সকলেরই স্বাধীনতার দরকার বড় হইবার জন্য। বৃক্ষের পক্ষে মুক্ত আলোও বাতাসের প্রয়োজন, খাঁচায় পাখীর সৌন্দর্য্য, স্বর বিস্মৃত হইয়া উঠে; রুদ্ধ কুটীরে শৃঙ্খলাবদ্ধ পুরুষ অল্পেতেই স্বাস্থ্যশূন্য হইয়া পড়ে—শুধু ভারতের রমণীই কি গৃহাবদ্ধ অবস্থায় পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে? পুরুষের ন্যায়, স্ত্রীলোকেরও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রয়োজন, তা হৌক্ না কেন সে ব্যবস্থা পুরুষের পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত অসুবিধা জনক। স্ত্রীলোকেরা এতদিনে এ সত্যটী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে; ইয়ুরোপ এ্যামেরিকায় তাই তাহারা পুরুষের সঙ্গে সমান আসন পাইবার অধিকার দাবী করিতেছে ও ক্রমে ক্রমে পুরুষকে সরাইয়া নিজেদের স্থান করিয়া নিতেছে। এ্যামেরিকায় ইতিমধ্যেই শিক্ষাবিভাগে তাহাদের সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতেই কি শুধু তাহারা জন্ম ধরিয়া পুরুষের পা ধোয়া জল খাইয়া সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবতী মনে করিবে? তাহা কি আর ভবিষ্যতে সম্ভবপর হইবে? যে দেশে সরোজিনী নাইডু ও সরলা দেবীর মত রমণী দেখা দিয়াছে, স্কুল কলেজ বিদ্যার্থীণী বালিকায় ভরিয়া উঠিতেছে—সে দেশে যে কোন্ দিকে চলিয়াছে, কে না দেখিতেছে?

(৫)

জ্ঞান-বিজ্ঞানরূপ মহাদৈত্য সকল প্রকার ভুয়া দেবতাকে ধরিয়া ধরিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিতেছে; ধনী দেবতা, ব্রাহ্মণ

দেবতা, পতি দেবতা সকলকেই ব্যতিবাস্ত করিয়া তুলিয়াছে, এমন কি স্বয়ং ভগবানও বাদ যাইতেছে না। প্রাচীন সমস্ত কুসংস্কার জাতিভেদ প্রভৃতি, খরস্রোতে ভাসিরা যাইতেছে এবং সমস্ত কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া জাতি ধীরে ধীরে নূতনভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে। তাও বলিতে হইবে, 'মরিয়া না মরে রামের' মত শীঘ্র যে ইহাদের অন্ত হইবে তেমন সম্ভাবনা কম, কিন্তু ইহাও ঠিক, দু'দিন আগে আর পরে ইহাদের সরিয়া যাইতে হইবেই।

ভবিষ্যতের সমাজ! ভারতীয় সমাজ! কি মূর্ত্তি ধারণ করিবে? যাই কেন না বলি, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া অসম্ভব, অবনত মস্তক হইয়া তাহাদের শিক্ষা মানিয়া লইতেই হইবে; সত্য গৃহীত হইবেই, গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। আচার-পদ্ধতি, চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছেদ সমস্তই এই প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে, হইবে। আমাদের অতি প্রাচীন বিধিব্যবস্থা পূর্ণরূপে আর চলিবে না, প্রাচীনগৃহকে নূতন সব খুঁটীদ্বারা সংস্কার করিয়া লইতে হইবে। জগতের সর্ব্বত্রই সাম্যের ভাব প্রচারিত হইতেছে, আমাদিগকেও তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। ধনী দরিদ্রে মিশিয়া কালে একাকার হইয়া যাইবে, সকলেরই বাঁচিবার, বড় হইবার, মানুষ হইবার সমান অধিকার থাকিবে; ব্রাহ্মণ অ-ব্রাহ্মণ থাকিবে না, অস্পৃশ্যতার পূর্ণ লোপ হইবে; জাতি-বিচার থাকিবে না; স্ত্রীলোক পূর্ণ স্বাধীন হইবে, ও সকল বিষয়ে পুরুষের সঙ্গে পূর্ণ অধিকার সম্পন্ন হইবে,। ধর্ম্ম! সত্যের উপর যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত নয়, তাহাও থাকিবে না। বিজ্ঞানের আক্রমণে সকল ধর্ম্মেরই শেষ দশা উপস্থিত হইয়াছে—ভগবান, আত্মা, পরমাত্মা, যে সকল মূল ধারণার উপর ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, সবই যে মানুষের ভুয়া কল্পনা! এই ধর্ম্ম লইয়া মানুষ কি করিবে? স্বর্গ, মোক্ষ, মুক্তি, সব, সবই মিছা। সব ধর্ম্ম লোপ পাইতেছে, কিন্তু লোকের অলক্ষিতে নূতন ধর্ম্মেরও সৃষ্টি হইতেছে। এই ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য সকল মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন। এক মহা-সমদর্শিতার ভাবে ইহা অনুপ্রতিষ্ঠ হইবে ভগবান বা আত্মা, পরমাত্মার ইহাতে স্থান নাই। মানুষের সকলের পক্ষে যাহাতে জ্ঞান, বাসস্থান, খাদ্য, ও পোষাক পরিচ্ছদ সমানভাবে অনায়াস লভ্য হয় ভবিষ্যতের সমাজের তাহাই প্রধান লক্ষ্য হইবে। খাঁটী প্রত্যক্ষ সত্যের উপর, কল্পনা কল্পনার উপর নয়, সে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে—সকলের সুখবিধান ও উন্নতিই যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। সমাজের একদিকে ক্রোড়পতি, অন্যদিকে নিরন্ন নির্বস্ত্র দরিদ্র—এ অবস্থার অন্ত হইবে। কালে সমস্ত প্রচলিত ধর্ম্মই বিলুপ্ত হইবে, এবং তাহার স্থলে এক মানব সেবা, জীব সেবারূপ মহাধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। বহুযুগের দরকার, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, পার্শি, জৈন, শিখ মিলিয়া এক মহাজাতির সৃষ্টি হইবে এবং সেই জাতি ভবিষ্যতের জগৎব্যাপী বিশাল মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত হইবে। ভারতবাসী বলিয়া কোনও জাতি থাকিবে না, এ সব অর্থশূন্য মনগড়া ভৌগলিক চিত্রের উপর রচিত জাতির অস্তিত্ব আর কত দিন থাকিবে?

নানাদিক হইতে Parliment of men. Faderation of the world প্রভৃতি বড় বড় কথা শোনা যাইতেছে। তাহা কি কখনো সম্ভবপর হইবে! রেলওয়ে, জাহাজ, মটরকার, এরিওপ্লেন, টেলিগ্রাফ, রেডিওগ্রাফি, বায়স্কোপ, গ্রামোফান প্রভৃতি কল্যাণে দূরত্বের বিনাশ সাধনের সঙ্গে জগতের সকল জাতির একে অন্যের সঙ্গে মিলিবার মিশিবার নানাপ্রকার সুযোগ সুবিধা হইয়াছে, মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া এক ভাব-ধারার আদান প্রদান হইতেছে, প্রতিনিঃশ্বাসে একে অন্যের ভাব গ্রহণ করিয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এক মহামানবজাতি গঠনের সমস্ত সম্ভারই প্রস্তুত। কিন্তু এই জাতি গঠিত হইয়া উঠিবে কি? একই প্রকার ভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া ভাই ভগ্নীজ্ঞানে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হইবে কি! মহাপুরুষগণের স্বপ্ন সফল হইবে কি! তাহা কি সম্ভবপর। মানুষ যে মহা হিংস্রক জন্তু—ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতির পর্য্যায় ভুক্ত; ইহা বিজ্ঞানেরই বাণী। এমন হিংস্র জন্তু আর নাই, এমন স্বার্থলোভী, পরপীড়নকারী, হিংসুক, পর অনিষ্টকারী। সকল মানবের মিলন, এমন হিংস্রজন্তু সমূহের মিলন—অসম্ভব

ভারতবর্ষ! বুদ্ধ, অশোকের জন্মস্থান ভারতবর্ষ! এখান হইতে যে প্রেমের বাণী ন্যায়-সাম্যের বাণী প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার ফলে এক সময় অর্দ্ধ-এশিয়া কথঞ্চিৎ শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মানব সেবা জীব সেবারূপ মহা

প্রবেশ করাইয়া দিলেন ; তাহাতে জ্বরের সামান্য লক্ষণ মাত্র প্রকাশ পাইল। পনর দিন পর ১২ ঘণ্টা উত্তাপে রক্ষিত হইয়াছে এইরূপ পূর্ব্বাপেক্ষা তীব্রতর জ্বরের বিষ সেই ভেড়াটীর রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইল কিন্তু বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। আবার পনর দিন পরে এনথ্রাক্সের কীটাণু উত্তপ্ত না করিয়া সাধারণ অবস্থায় সেই ভেড়াটীর দেহে প্রবিষ্ট করা হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রোগের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। অন্য যে কোন ভেড়া সেই মারাত্মক বিষে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। আফিং খাইয়া যাহারা অভ্যস্থ তাহারা যে পরিমাণ আফিং খাইয়া আরাম বোধ করে সেই পরিমাণ আফিং খাইলে অন্যের প্রাণ নাশ হইয়া থাকে। সকল বিষ সম্বন্ধেই এই অভ্যাসের ফল এক প্রকার হইয়া থাকে।

ব্যাধির বীজাণু কোন বিশেষ বিশেষ প্রাণীর দেহে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বর্দ্ধিত হইতে দিলে ইহার তীব্রতা ইচ্ছানুযায়ী হ্রাস বৃদ্ধি করা যায়। এই সত্যও মহাত্মা পাস্তর আবিষ্কার করেন এবং পরীক্ষা দ্বারা তিনি ইহাও সপ্রমাণ করিয়াছেন যে কোন ব্যাধির নাতিতীব্র বীজাণু জীবদেহে প্রবেশ করাইয়া দিলে সেই ব্যাধির লক্ষণ স্বল্প পরিমাণে প্রকাশ পাইয়া থাকে বটে কিন্তু তাহাতে ভবিষ্যতে ঐ ব্যাধির মারাত্মক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই মহাসত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। এখন ব্যাধির বীজ দ্বারাই সেই ব্যাধির চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে। বসন্ত প্লেগ প্রভৃতি ব্যাধির টিকার মূলেও এই সত্য নিহিত রহিয়াছে। ইহাই Vaccination

ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুর প্রভৃতি জন্তু দংশন করিলে ভীষণ জলাতঙ্ক রোগ জন্মে। পাস্তরের আবিষ্কৃত অভিনব প্রণালী মতে চিকিৎসা করিলে এই মারাত্মক ব্যাধি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরের দংশনের ৪২ দিন পর জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়। পাস্তর সিদ্ধান্ত করিলেন, যদি দংশনের পর সেই রোগের জীবাণু সামান্য পরিমাণে দষ্ট ব্যক্তির শরীরে ৪২ দিন পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় তবে সেই সাংঘাতিক ব্যাধি হইতে কিছুতেই রোগীর মৃত্যু ঘটিতে পারে না।

একবার এক কৃষকের পুত্রকে একটা নেকড়া বাঘে কামড়াইয়াছিল। পাস্তর তাঁহার আবিষ্কৃত প্রণালী অনুসারে বালককে জলাতঙ্ক রোগের টিকা প্রদান করিলেন। সেই বালকের দেহে আর রোগের লক্ষণ দেখা দিল না। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া চিকিৎসকগণ অতিশয় চমৎকৃত হইলেন। তখন হইতে পাস্তরের চিকিৎসা প্রণালী বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিলেন। পারিস নগরে পাস্তরের স্মৃতি রক্ষার্থ একটী রমণীয় বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার প্রথম চিকিৎসার স্মৃতি স্বরূপে উহার সম্মুখে একটী কৃষক বালক ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিতেছে এই সুন্দর প্রস্তর মূর্ত্তিটী স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে সম্প্রতি পাস্তরের আবিষ্কৃত প্রণালী অনুসারে জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা হইতেছে। কলিকাতা, কৌসলি ও শিলং এ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহু রোগী পূর্ব্বোক্ত হাসপাতালে চিকিৎসিত হইয়া এই দুরন্ত জলাতঙ্ক ব্যাধির আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে বালি ও ধূলির সহিত খাদ্য ও পানীয় জলের সহিত সর্ব্বদা নানা প্রকার ব্যাধির বীজাণু আমাদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করিতেছে। তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার তবুও আমরা পীড়িত হইতেছি না কেন? ইহার কারণ আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ করিবার একটী স্বাভাবিক শক্তি আছে। সেই শক্তি প্রভাবে আমরা ব্যাধির বীজাণুকে পরাজয় করিতে পারি।

যতক্ষণ এই শক্তি প্রবল থাকে ততক্ষণ ব্যাধির আশঙ্কা নাই। কিন্তু এই শক্তি সকলের সমান থাকে না কিম্বা এক ব্যক্তির ও সকল সময়ে সমান শক্তি থাকে না। এই জন্য সুস্থ ও সবল ব্যক্তি সহজে রোগাক্রান্ত হয় না কিন্তু দুর্ব্বল ব্যক্তির সর্ব্বদা ভয়ের কারণ রহিয়াছে। আবার সবল ব্যক্তিও যদি আহার নিদ্রার অনিয়মে অথবা অন্য কোন কারণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তবে তাহার দেহস্থ ব্যাধির বীজাণু প্রবল হইয়া রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। যেমন বীজ কঠিন মাটিতে পড়িলে অঙ্কুরিত হইতে পারে না কিন্তু বারিপাতে ক্ষেত্র নরম হইলেই অঙ্কুরের উদ্গম হয়।

ব্যাধির বীজ সকল জীবদেহেই রহিয়াছে কেবল অনুকূল অবস্থা পাইলেই ইহার বিকাশ হয়।

ম্যাচনিকফ্ নামক একজন রুশদেশীয় পণ্ডিত সপ্রমাণ করিয়াছেন যে রক্তে দুই প্রকার কীটাণু আছে। এক প্রকার কীটাণুর রঙ্ শুভ্র অন্য প্রকারের রঙ্ লাল। এই শুভ্র কীটাণুর কাজ জীব শরীরে ব্যাধির জীবাণু প্রবেশ করিতে না দেওয়া। তরল রক্তের সহিত বিচরণ করিয়া উহারা সর্ব্বদা দেহাভ্যন্তরে পাহারা দিতেছে। তাহাদের বেরাম নাই। শরীরে রোগের বীজাণু প্রবেশ করিলেই ইহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম বাঁধে। সংগ্রামে যদি রক্ত কীটাণুর জয় হয় তবে আর কোন চিন্তার কারণ নাই। ইহা দিগকে পরাস্ত না করিলে দেহে ব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না। আমাদের শরীরের কোন ক্ষতস্থান উন্মুক্ত থাকিলে বায়ুস্থিত কীটাণু তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে। সেই সময়ে রক্ত কণিকার সহিত প্রবিষ্ট কীটাণুর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তাহার ফলে ক্ষতস্থান স্ফীত ও উত্তপ্ত হয়। রক্ত কণিকার জয় হইলে ঘা অচিরে শুকাইয়া যায়। কিন্তু পরাজয় হইলে সেই স্থান পঁচিতে আরম্ভ করে এবং পুঁজ নির্গত হয়। তখন ঔষধ দ্বারা রক্তকীটাণুর সাহায্য না করিলে ক্ষত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

শিক্ষার মোহ

(শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বেদান্ত শাস্ত্রী)

যে কুসুম স্বকীয় স্বাভাবিক সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করে, মন প্রাণ প্রফুল্ল করে সেই কুসুম সাধারণতঃ জনপ্রিয় হয়। আর যে কুসুম কি সৌরভে কি রূপে সর্ব্বপ্রকারে মানবের মন আকর্ষণ করে, শুধু আকর্ষণ নহে, আনন্দময় করে, অসুস্থ মনকে সুস্থ করে, সেই কুসুম বিশেষ ভাবেই সকলের কাম্য; দেবতার নিকটেও সেই জাতীয় পুষ্পের সমধিক আদর। যে সমস্ত দেশে সাকার দেবতার স্বীকার নাই সে সমস্ত দেশেও পুষ্পের আদর কম নহে। মানুষের মধ্যে যাঁহারা গুণে মানে ধনে শ্রেষ্ঠ তাঁহারাও পুষ্প উপহারে মুগ্ধ হন।

শিক্ষারও দুইটা দিক আছে। একটা ফুলের রূপের মতো বাহিরের দিক, অপরটা ফুলের সৌরভের মতো ভিতরের দিক্। যে শিক্ষায় পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সৌরভময় করে, সাধারণ জনমণ্ডলীর মধ্যে অধিকাংশের মনেই আনন্দ জাগাইয়া দেয়, সেই শিক্ষাই সুগন্ধি কুসুমের মতো সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়। আর, যে শিক্ষার শুধু রূপ আছে, চাকচিক্য আছে, ঝল্-ঝলায়মান বিলাস চাতুরী আছে সেই শিক্ষা কতিপয়ের নিকট গ্রাহ্য হইতে পারে বটে কিন্তু উহা সর্ব্বগ্রাহ্য নহে। পরন্তু যে শিক্ষার রূপও নাই গুণও নাই বরং নক্কার জনক বীভৎসতা আছে, প্রাণ নাশকর মাদকতা আছে, জাতি নাশকর নেশা আছে, তেমন শিক্ষা বিষময় পুষ্পের মতো সকলেরই বোধ হয় ত্যাজ্য।

আজ আমাদের দেশে যেরূপ শিক্ষার বিস্তৃতি লাভ ঘটিতেছে তাহা গুণে ভালো কি রূপে জম্‌কালো তাই নিয়ে সুধীমহলে আন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; এবং আলোচনার সূত্রপাত নহে, ঘাত প্রতিঘাত ও আরম্ভ হইয়াছে। কাহারও মতে বর্ত্তমান শিক্ষায় আমাদের দেশ কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি অর্থনীতি বা ধর্ম্মনীতি সকল নীতিতেই পিছাইয়া পড়িতেছে, অথচ কি আশ্চর্য্য! এতজ্জাতীয় আলোচনা-কারীদের মধ্যে অধিকাংশই কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষানুগত বহির্বিলাসে মুগ্ধ। এক শ্রেণীর লোক বর্ত্তমান বৈদেশিক শিক্ষা ও সভ্যতা চায় না অথচ পাকে প্রকারে সেই শিক্ষাকে কিন্তু বরণ করিয়া নেয়। এই প্রকারের যে দ্বৈত মনোভাব তাহাতে সরল প্রাণ ব্যক্তিগণ প্রতারিত হন। শিক্ষার সংস্কার অনেকেই অনেক দিন যাবৎ চাহিতেছেন, বৈদেশিক শিক্ষারও নিন্দা করিতেছেন, কিন্তু কৈ? এত আন্দোলন সত্বেও আমাদের দেশে দেশীয় রক্তমাংসানুমোদিত শিক্ষারও প্রচলন হইতেছে না।

৫০। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে সমস্ত অপ্রিয় ছিল, এখন তাহাই প্রিয়রূপে দেখা যাইতেছে। নিত্য নূতন আধি, ব্যাধি, দীনতা, হীনতা, নানা ছন্দে নানা সুরে সমাজের সুস্থ শক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে। যতই লোক শিক্ষার সংস্কার চাহিতেছে, সভ্যতার উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, ততই যেন আমাদের দেশের হাব ভাব, রীতি নীতি, চাল চলন লোপ পাইতেছে। আচারে আহারে আকারে প্রকারে ভূষণে পরিচ্ছদে, ভাবে ভাষায় এমন কি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষামুগ্ধ আমরা প্রাচ্যের

জেলা ময়মনসিংহ পরগণে হোসেনসাহীর অন্তর্গত নান্দাইল থানার এলাকাধীন আউটপাড়া গ্রামে ১২৪৮ সনে মাঘ মাসে মঙ্গলবার শ্রীরামচন্দ্র মালী (রামু সরকার) জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৺রামপ্রসাদ মালী, মাতার নাম রামমণি দাসী। উক্ত আউটপাড়া গ্রামে একটী কবির দল ছিল তাহার বয়স যখন ৮।৯ বৎসর, তখন ঐ দলে গিয়া গান শুনিতেন, সন্ধ্যাকালে সকল রাখাল বালক সহ একত্রিত হইয়া ঐ সকল ছড়া পাঁচালীর আলোচনা করিতেন। ইহার স্মৃতিশক্তি এত প্রবল ছিল যে, একবার যাহা শুনিতেন তাহাই অভ্যস্ত হইত। ইহার এরূপ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া আউটপাড়া নিবাসী স্বর্গীয় অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজ বাড়ীতে আনাইয়া কবির গান ও ছড়া পাঁচালী রচনায় উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং মহাভারত, রামায়ণ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের প্রস্তাবগুলি মুখে মুখে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপ শিক্ষাতেই কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার অদ্ভুত রচনা শক্তি জন্মিল। পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য তাহার রচিত ভক্তি সঙ্গীত একটী ও ঈশ্বর বন্দনা প্রভৃতি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

হরি বলে ডাকরে আমার মন
এল, নিকটে শমন তুমি কার আশায় বসিয়ে রয়েছ,
তোমার গণার দিন যে দিনে দিনে গত হ'ল তাকি টের
পেয়েছ ॥

যাবে যদি ভব পারে বল কৃষ্ণ হরে হরে
কেন ভ্রান্তে পড়ে ভুলিয়ে রয়েছ
ঠেকে ভবের ফান্দে রামু কান্দে
ভক্তি ধনে মন বঞ্চিত হয়েছ
এ দেহ থাকৃতে চেতন হরি বল মন
জীবনের ভরসা আর কি
যখন এসে শমন দিবে দরশন
তখন ঘোর হবে দুই আখি
যার জন্য খাট বেগারী তারা সব রবে পড়ি
একা পালাবে প্রাণ পাখি

তোমার ভবের কামাই ভবে রবে,
মন তোমায় দিলেই বা কি নিবেই বা কি।
আমি মূর্খ নিতান্ত ভ্রান্তে হই অশান্ত
শ্রীকান্ত জানি না কখন
সদায় করি দুশ্চিন্তে চিন্তা মণি করি চিন্তে
নিশ্চিন্ত মন থাকে না কখন
যার করিলে চিন্তে দূরে যাবে সকল চিন্তে
চিন্তামণি চিন্তার কারণ
কে পারে তাঁহারে চিন্‌তে যে চিন্‌তে সে চিন্‌তে
আমার জন্ম গেল চিন্‌তে চিন্‌তে, চিন্‌তে পারিনে কখন
মুক্তিকর্ত্তা জনার্দ্দন এ ধন বিনে আর কি ধন
ত্রিজগতের মোক্ষধন চিন্তা কল্লে সে চরণ
মোক্ষধামে হয় গমন।
ত্রিজগতের তারণ কারণ যিনি হল কারণের কারণ
ক এতে কৃষ্ণ নাম লিখন আমি তা জানিনে কখন।
উদ্দেশ্যেতে নিবেদন করি প্রভু জনার্দ্দন
বিপত্তে মধুসূদন যা কর এখন ॥

ঈশ্বর বন্দনা

হে প্রভু জনার্দ্দন উদ্দেশ্যে করি নিবেদন
শ্রীচরণ পাবার আশার আশে:
পাপাশ্রিতে মতিচ্ছন্ন ভক্তি হয় না সে জন্য
মোক্ষ চরণ পাব আর কিসে
আমি মূর্খ ভক্তিহীনে পাবার আশা হয় না মনে
যদি তোমার দয়া গুণে পাই আমি দীনহীনে
কে আছ তুমি বিনে এ তিন ভুবনে
পাপী তাপী কতজনে উদ্ধারিলে নিজগুণে
কিঞ্চিৎ করুণা গুণে দয়া কর এ অধীনে
তুমি কৃষ্ণ ব্রজের বনমালী
আমি তোমার হতে ভক্ত
যে দিন হবে জীবন মুক্ত
কইরো মুক্ত বলে রামু মালী।

গুরু বন্দনা

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনে এক দেহ
জীব উদ্ধারিতে ভবে আর নাই কেহ
সেই গুরুতে ভক্তি হয় না আমার আমার করি
কেবা আমার আমি বা কার জান্তে নয়কো পারি

বাদসার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে, অশান্তির অবসানত হইবেই না, অধিকন্তু জীবন নাশের আশঙ্কাও রহিয়াছে !—মতিয়া সমস্ত কথা নীরবে শ্রবণ করিত, এবং বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আচ্ছাদন করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিত !

সেদিন ভোর নয়টায় বাদসা সাহেব কারাকক্ষ পরিদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। বিশেষ একটা উদ্দেশ্য লইয়া, বিকাল বেলাও আবার হোসেনআলীর কারাকক্ষের দ্বার উন্মোচন করিলেন। কক্ষের ভিতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই দেখিলেন, হোসেন ও মতিয়া একত্র উপবেশন করিয়া, অপলক দৃষ্টিতে বাক্যালাপ করিতেছে ! সেই অভাবনীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া বাদসা সাহেব একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার দেহের সমস্ত রক্ত যেন, অকস্মাৎ, অগ্নিতপ্ত সলিতাবৎ, আলোড়ন জাগাইয়া, মস্তক অধিকার করিয়া বসিল। রাগে, ক্ষোভে, তাঁহার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বাক্‌শক্তি হারা হইয়া তিনি কয়েক মূহুর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ;—এতবড় অসম্ভব ব্যাপার তাঁহার প্রাসাদের সীমানার ভিতর যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা তিনি পূর্ব্বে কখনও ধারণা করিতে পারেন নাই ! তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া, এমন দুঃসাহসিক কার্য্যসম্পাদন করিতে পারে, এমন লোক তাহার রাজ্যের ভিতর থাকিতে পারে, তাহা তিনি অনুধারণা করিতে পারিলেন না। তিনি অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া শ্লেষ প্রচ্ছাদিত কণ্ঠে বলিলেন "মতিয়া ! ঠিক করে বল, কে তোমাকে এ কক্ষে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছে ?—বল, এ মূহুর্ত্তেই তাঁর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে, প্রতিদ্বন্দ্বীতার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান কচ্ছি। এ কি ? চুপ করে রইলে যে, এতে তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই—মতিয়া !—তার নাম প্রকাশ করবে না ?

মতিয়া চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ নীরবে মস্তক হেঁট করিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। কোনই প্রত্যুত্তর করিল না।

বাদসা সাহেব পাঁচ মিনিটকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াও যখন কোন প্রত্যুত্তর পাইলেন না, তখন পুনরায় হোসেন আলীকে প্রশ্ন করিলেন। হোসেন আলীকেও নীরবে থাকিতে দেখিয়া, তিনি একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া গেলেন। শেষে দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে মতিয়াকে লক্ষ করিয়া বলিলেন "বল্‌বে না ? বেশ্‌ আমি এখনই সমস্ত কথা বেড় করে নিচ্ছি, এ কক্ষ হ'তে তুমি এ মুহূর্ত্তেই বেড়্‌ হয়ে এস, অপরাধীর বিচার, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই শেষ করে,—তবে ছাড়্‌ব।"

মতিয়া আর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। বাদসা সাহেব হোসেনের কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, মতিয়ার কক্ষের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মতিয়াও বাদসার আদেশে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল ! বাদসা সাহেব তীব্রকণ্ঠে বলিলেন "মতিয়া ! মনে রেখো, তোমাদের, যে পনর দিন সময় দেওয়া হইয়াছিল, তা, আজ শেষ হইয়া গেল, কাল তোমাদের বিচার শেষ করে, একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করে ফেল্‌ব। রাত্রির ভিতর তোমার মতামত ঠিক করে, রেখো।—আমার আদেশ তোমাকে আবার শুনিয়ে দিচ্ছি আমার পুত্রবধূ হ'তে যদি তুমি স্বইচ্ছায় স্বীকৃত না হও, তবে তোমার চোখের সম্মুখে হোসেনের মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে, তোমার সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষার সূত্র একেবারে ছিন্ন করে দিব ! এরপর তোমাকে আরও পনর দিন কারারুদ্ধ করে রাখবো ! পনর দিন অন্তেও যদি তোমার মতের পরিবর্ত্তন না হয়, তবে তোমাকে জীবন্ত কবর দিয়ে, এ অভিনয়ের যবনিকা টেনে দোব। বুঝ্‌লে ? আর যদি স্বইচ্ছায়, পুত্রবধূ হতে স্বীকৃত হও তবে তোমাদের দুজনার বিয়ে দিয়ে,—দৌলতের সহিত হোসেনের বিয়ে দিয়ে দোব। এই আমার সংকল্প,—এর ব্যতিক্রম কিছুতেই ঘট্‌তে দোব না।' বলিয়া বাদসা দ্বার রুদ্ধ করিয়া, দ্রুত সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

কয়েক মূহূর্ত্তের মধ্যেই কারারক্ষক তাজমহল হোসেনের সম্মুখীন হইয়া ক্রোধব্যঞ্জক তীব্রকণ্ঠে ডাকিলেন "তাজমল !"

তাজমল নত জানু হইয়া, বাদসাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইয়া উত্তর করিল "জনাব ! খোদাবন্ধ !"

বাদসা সাহেব উত্তাপতপ্ত অঙ্গার খণ্ডের মতই, আরক্ত মুখে তীব্র কণ্ঠে বলিলেন "তাজমল ! তোমাকে আমি একজন বিশ্বস্ত প্রহরী বলেই এতদিন জানতুম। তুমি এতবড় বিশ্বাসঘাতক, তা—ত ধারণা কত্তে পারিনি !"

হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা'ত আপনার চিন্তার অতীত বলেই মনে হয়! এর জন্য একদিন সকলকেই অনুশোচনা কত্তে হবে। আমি যা করেছি, তা' অন্তরের স্বর্গীয় ভাবের প্রেরণায়ই করেছি,—আপনার কোপ-দৃষ্টিতে পড়তে হ'বে এরূপ চিন্তা করার অবকাশ তখন পাই নি।"

বাদসা সাহেব ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ব'ললেন 'আমিনা! আমি এ রাজ্যের বাদসা, তোমার উপদেশ নিয়ে আমি রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালনা কত্তে ইচ্ছা করি না, এ বিরুদ্ধাচরণের ফল কি হবে তা তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ? তোমাকে আমি ভালবেসেছিলুম এখনও বাসি, তা'র জন্য মনে করো না, তোমার অন্যায় আব্দারের প্রশ্রয় দোব! সামান্য অপরাধে, আমি আজ ষোল বছর হ'ল আমার প্রাণ প্রতিমা, দলিয়া বেগমকে, ছয় মাস গর্ভাবস্থায়, জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা করে ছিলুম! আজও তাঁর স্মৃতি মনে করে, কত রজনী বিনিদ্রিত অবস্থায় কেটে দিচ্ছি। তোমাকেও এমনি একটা শাস্তি দিতে কণ্ঠাবোধ করব না! তাজমল দেখছি নিতান্তই নির্দ্দোষী, তা'কে আর তা'হলে কোন শাস্তি ভোগ কত্তে হবেই না!"

সহসা ককড় শব্দে বাজ হাঁকিলে মানুষের শিরায় শিরায় সেই ধ্বনি, যেমন কাঁপনের ঝন্‌ঝনি জাগাইয়া তোলে, বাদসার কথাগুলিও আমিনার শিরায় তেমনি ঝন্‌ঝনি জাগাইয়া তুলিল! আমিনার আরক্ত মুখ পুনশ্চ বিবর্ণতর হইয়া গেল! তাহার বক্ষ মথিত করিয়া নেত্র-অশ্রু-স্পন্দিত হইয়া আসিল! পাছে তাহার সেই দুর্ব্বলতাটুকুন ধরা পড়িয়া যায়, সেই ভয়ে আমিনা, আপনাকে সামলাইয়া লইয়া ক্ষীণ স্খলিত বাক্যে, দৃঢ়স্বরে বলিল "বাদসা সাহেব! বেগমের অভাবনীয় পরিণামের ইতিহাস আমি সমস্তই জ্ঞাত আছি। সে নৃশংস হত্যার ফলে, রাজ্যের অনেকেই আপনাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকে, শ্রদ্ধা বলে একটা জিনিষ, অন্ততঃ স্ত্রীলোকদের নিকট আপনি হারায়ে ফেলেছেন! বাদসার বেগম হওয়াটাকে এখন অনেকেই "মরণ নিয়ে খেলা করা" বলেই ধারণা করে! আমাকে জীবন্ত সমাধি দিবেন? এ-ই-ত আপনার শক্তি বিস্তারের শেষ সীমানা! বেশ্, তজ্জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই আছি। খাঁচা বদ্ধ পাখী বধ করে,—ব্যাধ যেমন কোন দিনই, কৃতিত্ব অর্জ্জন কত্তে পারে না,—অসহায়া স্ত্রীলোক বধ করে, যেরূপ বাদসার শক্তির উৎকর্ষতা কোন দিনই প্রমাণিত হতে চায় না! যা করেছি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি, ফল কি হবে তা'ত জানাই ছিল, আমি শক্তিহীন, প্রতিকারের সামর্থ কোথায়? তবু জানবেন, আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে মৃত্যুকে বরণ করাটা খুবই শ্লাঘনীয় কাজ বলে মনে করি।"

বাদসা সাহেব তিরস্কারের সহিত উচ্চৈস্বরে বলিলেন "আমিনা! আমার ভোগ ও তৃপ্তির সামগ্রী সংগ্রহ করার পূর্ণ শক্তি আমার রয়েছে, এর বিপক্ষে বাধা দেবার শক্তি কারো নেই বলেই,—রাজ্যের সকলেই মস্তক অবনত করে আমার আদেশ পালন করে থাকে! মতিয়াকে যখন পুত্রবধূ করবার বাসনা জাগরিত হয়েছে, তখন তোমার ঐ বক্তৃতার সূক্ষ্মতন্ত্রী ধরে আমি কখনও আপনাকে পরিচালিত কত্তে পারব না। যতটা আমি বুঝতে পেরেছি, আমার মনে হয়,—এদের বিবাহ ব্যাপারে তুমি আমার সহায় না হয়ে, হয় ত নানা বাধার সৃষ্টি করবে! এ অবস্থায় তোমার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকলে, এ বিবাহ অনুষ্ঠানের পক্ষে তুমি পাহাড় প্রমাণ প্রতিবন্ধক এনে দাঁড় করাবে! আজ হতে তুমি বন্দী, এ কক্ষেই তোমাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে! এদিকের সমস্ত গোলযোগ থেমে গেলে, তোমার মুক্তি হবে! পরে আমার ইচ্ছা হলে, তোমাকে বেগমরূপে গ্রহণ কত্তে পারি, সে বিষয়ে তোমার মতামতের উপর নির্ভর করে চলার কোন প্রয়োজন দেখি না।"

আমিনা উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল "আমি বন্দী? তাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই, তবে বাদসা সাহেব! এটা বিশেষ করে জেনে রাখবেন, -ভালবাসার রাজ্য স্নেহের-বন্ধনেই সুগ্রথিত, অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে সে রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করা যায় না! জোড় করে বেগম করে নেওয়ার ফলে,—প্রেমের অমৃতময় পীযূষধারা পান করবার সুবিধা কোন দিনই, কারো ভাগ্যে ঘটে উঠে না।"

বাদসা সাহেব তাচ্ছিল্যপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, দৃঢ় স্বরে বলিলেন "বাদসার নিকট সে সমস্তও অনায়াস-লব্ধ-বলে মনে হচ্ছে।" বলিয়া বাদসা সাহেব সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পর মুহূর্ত্তে বাদসার আদেশে, আমিনাকে, সেই কক্ষেই আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। (ক্রমশঃ)

তিনি যে সময়োচিত মন্তব্য করিয়াছেন তাহা তাহার বিচক্ষণতারই পরিচায়ক। আমরা এইখানে সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

* * * *

"বস্তুতন্ত্র সাহিত্য লইয়া কিয়ৎকাল যাবৎ বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে তুমুল কলহের সূত্রপাত হইয়াছে। বস্তুতন্ত্র সাহিত্যের অন্যদিক লইয়া কলহ দেখিতে পাই না, কিন্তু নর-নারীর যৌন সম্মিলন প্রশ্ন লইয়াই যত অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ সাহিত্যের বিরোধী ব্যক্তিগণ সমাজের অকৃত্রিম হিতৈষী, তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি। কিন্তু তাঁহাদিগকে অনুনয় করিয়া বলি, যে হাওয়া দিগন্ত হইতে ক্রমশঃ প্রবলতর বেগে বহিয়া আসিতেছে তাহার গতি সর্ব্বতোভাবে রোধ করার চেষ্টা ঐরাবতের জাহ্নবী তরঙ্গ রোধের চেষ্টার মত নিষ্ফল হইবে কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ঐ ঝড়ো হাওয়া আসিতে দেখিয়া নিষ্ফল ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইবেন না। উহা যাহাতে কোনও পূতিগন্ধ বহন করিয়া আনিতে না পারে, শুধু তাহারই চেষ্টায় শক্তি প্রয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই হাওয়া বহিয়া নিঃশেষ হইয়া যাউক; ইহকাল-সর্ব্বস্ব ভোগেচ্ছামূলক এই হাওয়া জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্ ও কর্ম্মবাদী ভারতের হৃদয়ে কোনও স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারিবে না।"

"ইউরোপের মনীষা সম্পন্ন বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিকগণ প্রধানতঃ অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের শক্তিশালী লেখনী চালনা করিয়াছেন। তাঁহারা নরনারীর যৌন সম্মিলনের প্রশ্ন সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে ইউরোপেও যে তীব্র ও তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ সমুত্থিত হইয়াছে তাহা সুধী-সমাজ অবিদিত নহেন। ইউরোপের সামাজিক সমস্যায় ঐ যৌন সম্মিলনের প্রশ্ন পরীক্ষিত ও আলোচিত হওয়ার অবকাশ থাকিতে পারে, কিন্তু ভারতের আদর্শবাদী জীবাত্মা ইউরোপের প্রত্যক্ষবাদী জীবাত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিভন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট, ইহা স্মরণ রাখিতে আমি বস্তুতন্ত্রবাদিগণকে মিনতি করিতেছি। বঙ্গদেশেও সামাজিক দুর্নীতি অপসারণের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া যে সমস্ত বস্তুতন্ত্রবাদিগণ বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে লেখনী চালনা করিতেছেন তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য সাধু; তাঁহাদিগকেও আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যে রসের আলোচনা করিয়া বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় নির্ব্বিকার থাকেন এবং শুধু রসটীরই ভালমন্দ বিচার করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করেন, সেই রসটীরই যুবকযুবতীর সম্মুখে উপস্থাপিত হইলে উঁহারা তাহা বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়া নিজদেহে বিষক্রিয়া ঘটাইবার হেতু জন্মাইতে পারেন। এই যৌনসম্মিলন সম্বন্ধে লিখিত আধুনিক বস্তুতন্ত্র সাহিত্য হিন্দুর পারিবারিক বন্ধন, হিন্দুর সামাজিক পবিত্রতার আদর্শকে আঘাত করিতেছে; সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, বেহুলার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতেছে। ইহাতে যে দেশময় বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

তথাপি যাঁহারা সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য এইরূপ সাহিত্য লিখিতেছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যের সাধুতার জন্য তাঁহারা শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। কিন্তু একদল লেখক যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় সম্ভোগকেই বড় বা বাধাবিমুক্ত করিতে চাহেন। ইঁহাদের নিন্দার শেষ নাই। যে সাহিত্য দ্বারা লালসা বৃত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে বা পাপের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়া উঠে, তাহা হলাহল অপেক্ষাও ভয়ানক। কিন্তু যে সাহিত্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে এবং পাপের প্রতি সহানুভূতি না জাগাইয়া পাপীর প্রতি সহানুভূতি জাগায় তাহা আদর্শবাদীই হোক বা বস্তুতান্ত্রিকই হোক, তাহা সাহিত্য-সমাজে বরণীয়।"

* * * *

সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমোদকান্ত চক্রবর্ত্তী বি, টি, মহাশয় তাঁহার কার্য্য-বিবরণী পাঠ প্রসঙ্গে কয়টি সুন্দর ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম প্রস্তাব পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের বিভিন্ন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক এই সম্মিলনী বর্ষে বর্ষে নূতন স্থানে আহূত হইলে সাহিত্যিক ঐক্য সংঘটিত হইতে পারে এবং পরস্পর ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ লাভ ঘটে। তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই সম্মিলনীর মুখ-পত্ররূপে "ময়মসিংহ বার্ষিকী" অভিধেয় একখানা বার্ষিক পত্রিকা দুই খণ্ডে প্রকাশিত হউক। প্রথম খণ্ডে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান গুলির কার্য্য-বিবরণী থাকিবে, দ্বিতীয় খণ্ডে থাকিবে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ও সম্মিলনীতে পঠিত প্রবন্ধাবলী। দুইটি প্রস্তাবই সমীচীন হইয়াছে। দুইটিকেই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করা পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের

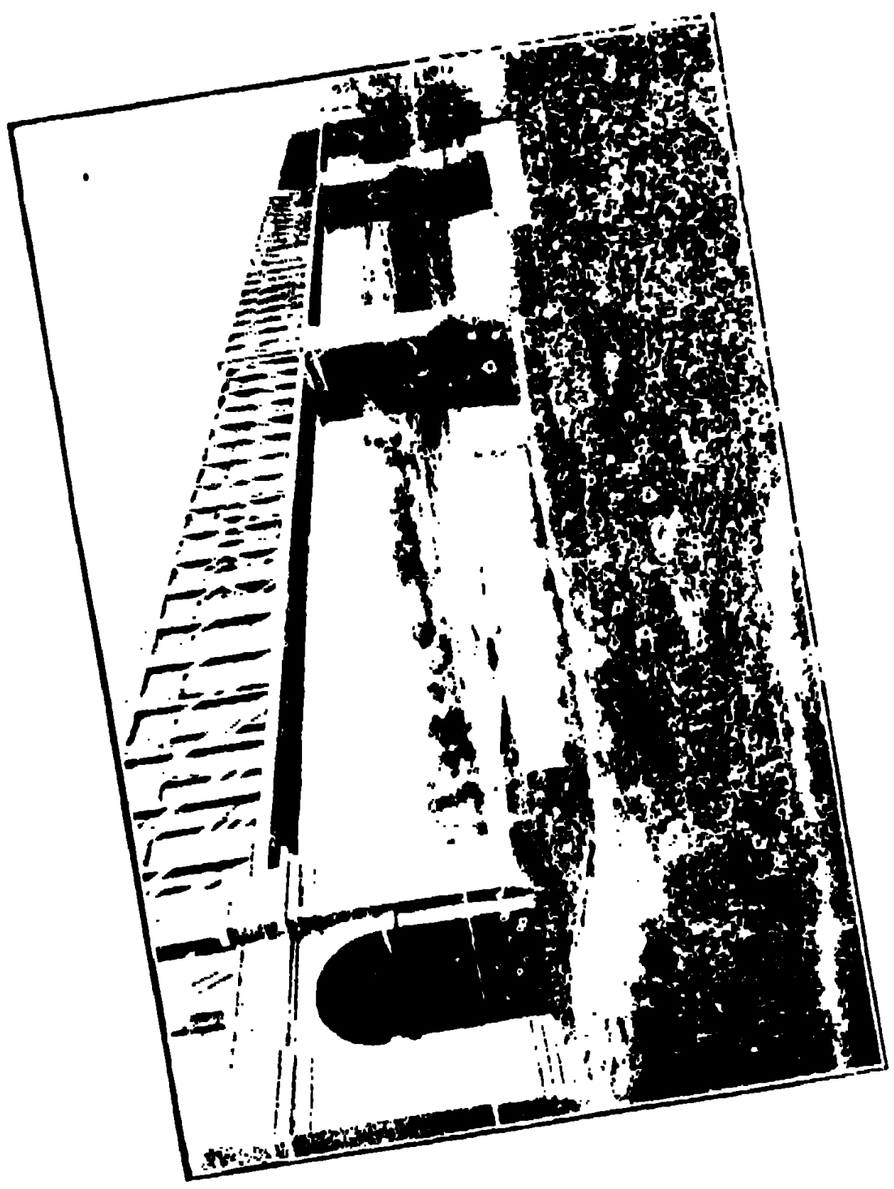

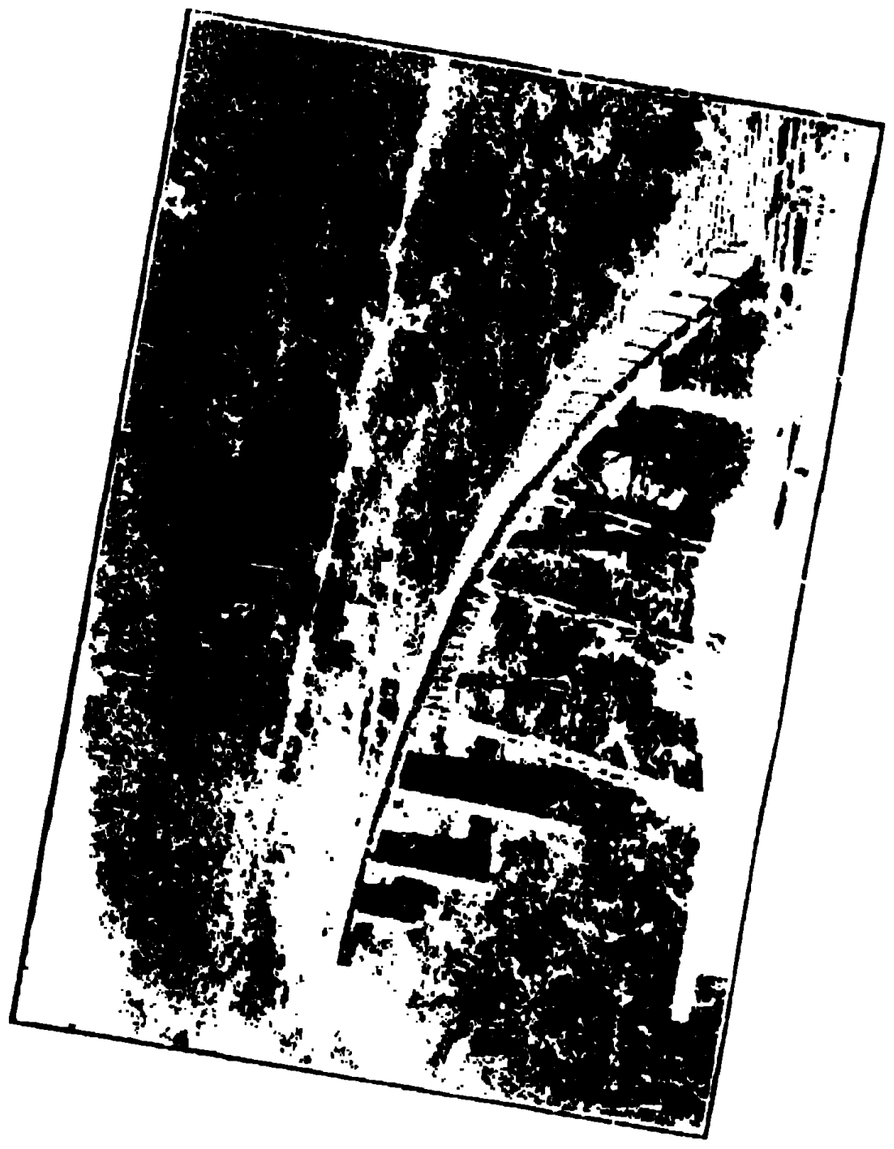

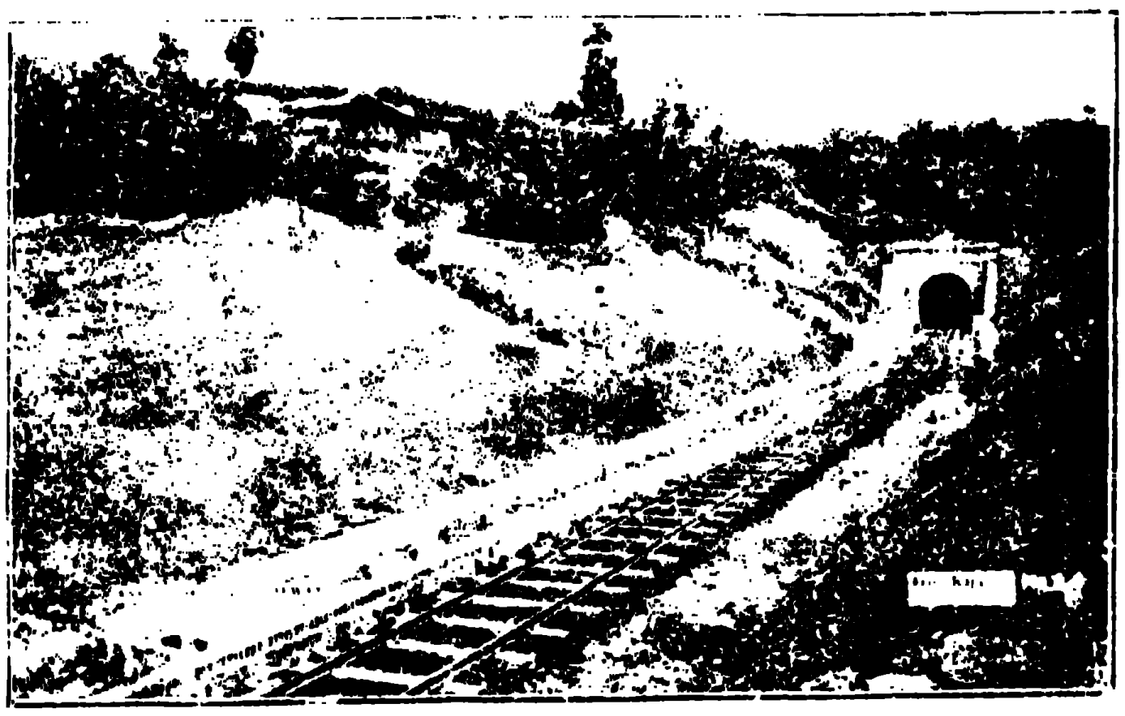

আসামের দৃশ্য।

হইল তাহাই হইল এ রাজ্যের রাজধানী, তাহারও নাম হইল "সুসঙ্গ," এবং সুসঙ্গের তটপ্রবাহিনী নদীর নামাকরণ হইল স্বীয় নামের অনুকরণে "সুমেশ্বরী"। বহুদিন স্বাধীন ভাবে হিন্দুর জ্ঞান গরিমা এতদঞ্চলে প্রচারিত করিয়া পূর্ব্বোত্তর ভারতে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটী এক সময়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময় "মুল্‌কে সুসঙ্গ" গারোপর্ব্বতের বলশালী সুবৃহৎ হস্তীর সংগ্রাহক বলিয়া দিল্লীতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

আজকাল সুসঙ্গের জঙ্গল বলিতে "গারোহিলের পাদ দেশস্থ ময়মনসিংহের জেলার উত্তর পূর্ব্ব সীমানাস্থিত বনানীকেই বুঝিতে হইবে। অন্যূন পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে, সুসঙ্গ গ্রামের ২। ৩ মাইল পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীহট্ট জেলার সীমানা পর্য্যন্ত পাহাড়ের প্রান্তস্থিত সমুদয় ভূভাগ গভীর অরণ্যানী পরিপূর্ণ ছিল। এই সমস্ত বনানীর মধ্যে মধ্যে পাহাড় হইতে উৎপন্না খড়স্রোত তটিনীর অভাব ছিল না—জলের মধ্যে মধ্যেই ছোট বড় বহু বিল ছিল। অধিকাংশ জঙ্গল বাতা, ইঁকড়, নল, খাগ, তাড়া প্রভৃতি এবং কোথাও বা উচ্চ ভূমিতে নাতিদীর্ঘ বৃক্ষাদিপূর্ণ জঙ্গলও ছিল। তদ্ভিন্ন বিলগুলিতে ধান্য জাতীয় ঘাসের প্রাচুর্য্যই ছিল। যাঁহারা বাংলা এবং আসামের বন্যজন্তুর স্বভাবের সহিত পরিচিত, তাঁহারা জানেন যে সর্ব্বদা পর্ব্বতচারী জন্তু ভিন্ন অন্য সমুদয় জন্তুর আবাস ভূমি হিসাবে এই শ্রেণীর বনানী কিরূপ উপযোগী।

মনোরম বৃক্ষাদি বনের শোভা, কিন্তু এই শোভার বৃদ্ধি হয় নানা বর্ণযুত বিচিত্র পুষ্প, সুন্দর পক্ষী এবং মৃগাদি আরণ্য জন্তুরদ্বারা। পুষ্পিত বৃক্ষের প্রাচুর্য্য .এতদঞ্চলের বনানীতে না থাকিলেও একটা নয়ন-স্নিগ্ধকর চিরশ্যামল রূপের জন্য এখানকার বনানীর একটা আকর্ষণ আছে এবং পক্ষী ও জন্তুর জন্য এই সমস্ত জঙ্গলের লোক-প্রসিদ্ধি এখন পর্য্যন্ত আছে।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও দলে দলে আরণ্য হস্তী গারো পাহাড় হইতে অবতরণ করিয়া সমতটের ধান খাইয়া সপ্তাহ কাল সুসঙ্গের প্রান্তস্থিত বনানীতে স্বচ্ছন্দ বিহার করিত। কিন্তু বিগত পঞ্চদশ বৎসর হইল এতদঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

এতদঞ্চলে ভূমিকম্প প্রায়ই হয়। ফলে, কোনও স্থান উচ্চ এবং কতক স্থান নীচ হইয়া যাইতেছে। ১৩০৪ সনের প্রলয়কারী ভূমিকম্পের পর হইতে সুসঙ্গের পূর্ব্ব দিকে অনেক বিল ভরট হইয়া আবাদ যোগ্য হইয়াছে। ফলে, অন্যান্য অঞ্চল হইতে বহুলোক আসিয়া জঙ্গল আবাদ করিয়া নূতন বসত করিয়াছে। এই কারণে সুসঙ্গ হইতে ১৫। ১৬ মাইল পূর্ব্ব উত্তরে না গেলে এখন আর শিকার ভূমি পাওয়া যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে, আজকাল শিকার অধিকাংশই "কুলুনাকান্দা" থানার উত্তর ভাগে পাওয়া যায়। অবশ্য নিকটবর্ত্তী সাধারণ বনে কখনও কখনও ব্যাঘ্র এবং শূকর পাওয়া গেলেও ইহা শিকার ভূমি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

এ অঞ্চলের জঙ্গল আবাদ হওয়ায় শিকারের সংখ্যা স্বভাবতঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার উপর বর্ত্তমানে অস্ত্র পাওয়ার অধিকার প্রদান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট উদারনীতি অবলম্বন করায় বহুলোকের বন্দুক হইয়া গিয়াছে। বন্দুক থাকিলেই তাহার অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। ফলে, বহু পশু পক্ষী অযথা অবৈধ ভাবে হত হইয়া নিঃশেষিত হইবার উপক্রম ঘটিয়াছে। আত্মরক্ষা এবং ফসল রক্ষার্থে আনিত বন্দুক প্রায় সর্ব্বদাই প্রাণী বধার্থ ব্যবহৃত হয়। গৃহস্থকে আত্ম-রক্ষার্থেও ফসল রক্ষার্থে বর্ত্তমান যুগে আগ্নেয়াস্ত্র অবশ্যই দিতে হইবে। কিন্তু অস্ত্রগুলি যাহাতে কেবলমাত্র এই কার্য্যেই ব্যবহৃত হইতে পারে তজ্জন্য নাল কাটিয়া ছোট করিয়া দিলেই এই দুই কার্য্য সুন্দররূপে সাধিত হয়, অথচ অযথা পশুবধ কার্য্য ব্যবহৃত হইতে পারে না। শিকার যোগ্য বন্দুক কেবল মাত্র বিশিষ্ট ক্ষেত্রে দিলেই সমিচীন হয়।

যে পরিমাণ গরু প্রতি বৎসর গোমড়কে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগও এতদঞ্চলে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয় না। দুঃখের বিষয় গো রক্ষা কল্পে দেশের লোকের আদৌ দৃষ্টি নাই এবং রাজ সরকারেরই বা সেরূপ মনোযোগ কোথায়? কীট ভুক্ পক্ষী বিনাশের সঙ্গে পতঙ্গ বৃদ্ধি হওয়ায় শস্যের পক্ষে অধিক হানিকর হইতেছে কি না তাহাও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। আমাদের বিশ্বাস, বন্দুক সম্বন্ধে উল্লিখিত পন্থা অবলম্বন করিলে এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে Private Reserve রক্ষা কল্পে সহায়ক আইন সৃষ্ট হইলে

"সুখং বাঞ্ছতি সর্ব্বোহিতচ্চ ধর্ম্মসমুদ্ভবং।
তস্মাদ্ধর্ম্মঃ সদা কার্য্যঃ সর্ব্ববর্নৈঃ প্রযত্নতঃ॥

"দেবগোব্রাহ্মণ গুরুবৃদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যা নর্চ্চয়েৎ।

সর্ব্বদা ঈশ্বরারাধনা করিবে ব্রাহ্মণ গুরুসিদ্ধ ও আচার্য্যের অর্চ্চনা করিবে, গো পালন করিবে। বিশেষতঃ এই "ভিটামিনের" যুগে, খাদ্য দ্রব্যের ভেজাল বিভ্রাটে খাদ্য সম্রাট গব্য সংগ্রহার্থ সকলের গো পালনে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। গব্য যেমন রসনায় তৃপ্তিদায়ক তদ্রূপ শরীর পোষক মনের ও আনন্দদায়ক; গোময় গোমূত্র ম্যালেরিয়া ও কলেরার বীজাণু নাশক, পরোক্ষে জীবন রক্ষক শস্য বর্দ্ধক। বহু বিজ্ঞ ডাক্তারের মত উৎকৃষ্ট দধি দুগ্ধ ঘৃতে যে পরিমাণ ভিটামিন থাকে তাহাতে ইহা ব্যবহারে মানব শরীর সতত সুস্থ রাখিয়া তথা দীর্ঘ জীবন দান করিতে এরূপ খাদ্য আর নাই।

মূর্দ্ধা, কর্ণ, নাসা ও পাদদেশে নিত্য তৈল মক্ষণ করিলে দৃষ্টি, শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তি অটুট থাকে এবং অকালে কেশ পক্ক হয় না ও বাতের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রত্যহ কিংবা ঘন ঘন ক্ষৌরী হইবে না; ইহাতে চক্ষু ও দন্ত রোগের ভয়। তাই বোধ হয় আজকাল চশমা ও কৃত্রিম দন্তধারীর আধিক্য দেখা যায়।

মূত্র, দন্ত, উষ্ণীষ ও পাদুকা ধারণ করিবে। বাঙ্গালা দেশে উষ্ণীষ ধারণের প্রথা কেন যে নাই বুঝা কঠিন। সম্মুখে অন্ততঃ চতুর্হস্ত পরিমিত স্থানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পথ চলিবে। বর্ত্তমানে উৎকৃষ্ট প্রজনন অভাবেই আমাদের গৃহানন্দ বর্দ্ধক হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ সুস্থ শিশুর হাস্য কলরবে গৃহ মুখরিত না হইয়া অধিকাংশ লোকেরই মনে আশা ও আনন্দের পরিবর্ত্তে কৃষ, রুগ্ন, দুর্ব্বল শিশুর করুণ ক্রন্দনে নিরাশা ও নিরানন্দ বাড়িয়া চলিয়াছে।

এইরূপ অবস্থা দর্শনে অনেকেই মনে করেন—কাল বর্দ্ধিতা লাবণ্য ললামভূতা পূর্ণ যৌবন বিকশিতা বয়স্থা ষোড়শী যুবতী কন্যা বিবাহে এরূপ রুগ্ন ক্লিষ্ট সন্তানের জন্ম নিরোধ হইতে পারে। বস্তুত তাহা হয় না। সুস্থ পিতামাতার সন্তানই সুস্থ হইতে দেখা যায়। বয়োধিকার বিবাহে প্রায়ই যেন কতকগুলি রোগ বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। এরূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিষ্ট্রিয়া, প্রদর, মৃগী মূর্চ্ছা প্রভৃতি কতকগুলি যান্ত্রিক, স্নায়বিক ও মানসিক রোগ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমানে প্রসারলাভ করিতেছে দৃষ্ট হয়।

যৌবন তরঙ্গে তরঙ্গায়িতা তরুণীগণ নিজ নিজ মনোজাত কাল্পনিক ভাবে ভাবিত হইয়াই স্নায়বিক বিকারে আক্রান্ত হইয়া পরে। ইহার ফলে নূতন সংসার কল্পিত নন্দন কাননের পরিবর্ত্তে ভীষণ নরক যন্ত্রণার নিলয় হয়। তাই কবি বলিয়াছেন—

যৌবন বালক কানে পশি এই কথা কয়।
আসিয়াছি আমি আর কারে তব ভয়।
সে সময় মনে হয় আমার সমান।
হয় নাই না হইবে গুণের নিদান॥

যদি এইরূপ কল্পিত সুখের শূন্যোত্থান গঠিত করিবার সুযোগ না দিয়া, কল্পনা জাগিবার পূর্ব্বেই পাত্রস্থ করিয়া নৈতিক নিয়মিত জীবন যাপনের ধারায় তরলমতি তরুণী দিগকে রক্ষা করা যায়, তবে নানা মনোবিকার জনিত স্নায়ু ও যান্ত্রিক বিকার হইতে রক্ষা করিয়া সুস্থ সন্তান জনন উপযোগী জননী তৈয়ার করিতে পারা যাইতে পারে বলিয়া মনে করি। চরক সুশ্রুত প্রভৃতি প্রামাণ্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে ও এরূপ ভাবাত্মক প্রমাণই দৃষ্ট হয়। মনে রাখিতে হইবে বিবাহ শুধু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির আধার নয়। যথোচিত সময়ে বিবাহ সংসারকে নন্দনকাননে পরিণত করে। তাই কিছুকাল পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর প্রতি-পরিবারে স্বর্গসুখ বিরাজিত ছিল। তদন্যথায় এখন সংসার নরক যন্ত্রণার নিলয়ে পরিণত হইতেছে। মনে রাখা সঙ্গত যে যথোচিত কালে ফলপ্রসূ বীজ রোপন করিলেই উৎকৃষ্ট ফসল জন্মে নচেৎ অকালে অপক্ক বীজ অথবা ফল প্রসবের উপযুক্ত বীজ রোপিত হইলেও ঐ বীজ নিজে নষ্ট হইয়া ক্ষেত্রকে মরুভূমিতে পরিণত করে। ক্ষেত্র অনুপযুক্ত হইলেও বীজ নষ্ট হইয়া যায়। বিবাহ হওয়া মাত্রই জনক জননী হওয়ার অনুপযোগিতা সত্বেও যাঁহারা সন্তান কামনা করেন এবং সংযম অভাবে অধৈর্য্য হয়েন তাহারাই বাঙ্গালী নির্দ্দিষ্ট তথা কথিত আয়ুর্ব্বেদ নির্দ্দিষ্ট বিবাহের নিন্দা করিয়া থাকেন।

শলাকার সাহায্যে একটী আর্চ্চ লাইট প্রস্তুত করেন। ইহাই হইল ইলেট্রিক আর্চ্চ লাইটের জন্মদাতা বা আদি পুরুষ।

যাহা হউক ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহা কার্য্যতঃ বড় ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও অতি মন্থরগতিতে এই আলোক বংশের উন্নতি বিধান হইতেছে বলিতে হইবে। ডায়নেমো উদ্ভাবিত হইলে পর লোকে যত ইচ্ছা ইলেক্‌ট্রিসিটি আয়ত্ব করিতে পারিতেছে। কিন্তু আর্চ্চ লাইটের শক্তি অত্যন্ত অধিক। তজ্জন্য রেল ষ্টেশনে, সার্কাস পার্টিতে থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে প্রভৃতি সুবিস্তৃত স্থানের জন্য আর্চ্চ লাইটই অধিকতর উপযোগী।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বায়ু শূন্য কাচের ভাণ্ডে গ্রাফাইটস্ প্রভৃতি কয়লা জাতীয় দ্রব্যের শলাকা পূর্ণ করিয়া সোয়ন ও এডিসন বালব প্রস্তুত হয়।

দিনের পর দিন এই বালবগুলি ক্রমশঃই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে কার্ব্বনের স্থান Osmium ধাতু, osmium এর স্থানে tantalum এবং tantalum এর স্থানে tungster ধাতু দখল করিয়া বসিল। ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর আলো হইতে লাগিল। আলো দ্বিগুণ উজ্জল হইল।

আরও কিছুদিন পরে বালবের (bulb) * ভিতর argon গ্যাস পুরিয়া তাহাতে tengsten দেওয়া হইল। ইহাতে আলো ৬ গুণ উজ্জলতর হইল। এই ল্যাম্প আর্চ্চ লাইটকে পরাভূত করিতেছে। কেননা ইহার শক্তি ১০০০ হইতে ২০০০ বাতির শক্তির তুল্য।

১৫। ২০ বৎসরের মধ্যেই এই আলো যে কেবল ৬ গুণ উজ্জলতর হইয়াছে এমত নহে; সস্তাও হইয়াছে। বর্ত্তমানে রাস্তা, ঘরবাড়ী, কারখানা ইত্যাদির প্রায় তাবৎই এই কৃত্রিম বিজলী বর্ত্তিকা দ্বারা উদ্ভাসিত হইতেছে। ইহাতে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। কারণ প্রাচীন প্রথা মতে খোলা গ্যাসের আলোতে বায়ু দূষিত হইয়া থাকে।

জ্বালানি কাষ্ঠের পর চর্ব্বির বাতি ও ল্যাম্প,—তৎপর গ্যাস লাইট,—তৎপর বৈদ্যুতিক আলো বর্ত্তমানে বিজলী বর্ত্তিকায় টিপ দেওয়া মাত্র আলোতে উদ্ভাসিত হয়। এই রীতি প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এখনও আরও উন্নতি করিবার ঢের বাকী আছে। জোনাকি পোকা যে আলো দিতেছে তাহা সবচেয়ে নির্দ্দোষ কারণ ইহাতে উত্তাপ নাই কেবল আলোক আছে। আমরা যে শক্তি ব্যবহার করি তাহার সব অংশই যদি আলোকে পর্য্যবসিত হইত এবং কণা মাত্রও উত্তাপ বিকীরণ করিতে না পারিত তবে আমাদের আলো ও নির্দ্দোষ হইত। জোনাকীর আলোতে ultra-violet rays (যাহাতে চক্ষুর অনিষ্ট হয় এরূপ কিছু) নাই।

তৈল পুরাইলে যে শক্তি নিষ্কাশিত হয় তাহার $\frac{৫}{১০০}$ ভাগ মাত্র আলো উৎপাদন করে। বাকী সব টুকুই উত্তাপ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এইরূপ গ্যাস পোড়াইলে $\frac{৪}{১০০}$ অংশ ও বিজলী বর্ত্তিকা হইতে $\frac{১}{১০০}$ অংশ শক্তি (energy) আলো প্রদানে ব্যয়িত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট তাবৎ শক্তিই উত্তাপ প্রদানে নিযুক্ত হয়। আর্চ্চ ল্যাম্পের $\frac{৫-১০}{১০০}$ অংশ এবং সৌরকরের $\frac{৩-৪}{১০০}$ অংশ মাত্র শক্তি আলোক প্রদান করে।

সুতরাং জোনাকি প্রভৃতি পোকা যে প্রণালীতে আলো উৎপাদন করিয়া থাকে তাহা প্রায় নির্দ্দোষ। আমাদের অগ্নি প্রজ্জলন প্রণালীর চেয়ে তাহাদের প্রণালী অনেক উন্নত। জোনাকী পোকার এই রহস্য ভেদ করিবার জন্য সমুদয় সভ্য জগৎ এখন তৎপর হইয়া নিযুক্ত আছে। যদি সস্তায় জোনাকী পোকার মত স্নিগ্ধ আলো আমরা প্রস্তুত করিতে পারিতাম তবে আলোকের খরচ বর্ত্তমানে যাহা লাগে তাহার $\frac{১}{১০০}$ ভাগ লাগিত। তাহা হইলে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র লোকেও প্রায় বিনা ব্যয়েই তাহার জীবনের প্রায় সমুদয় আবশ্যকীয় আলো পাইতে পারিত। গবেষণার ফলে ২। ১ পুরুষের মধ্যে এইরূপ আবিষ্কারের আশা করা যাইতে পারে, বৈজ্ঞানিকগণের এরূপ অনুমান।

* বায়ুশূন্য কাচপাত্র।

কোন মতে টানিয়া লইয়া, অবশ, অসাড় জিহ্বাকে স্ববশে আনিয়া ক্ষোভ কম্পিত কণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব !—ঘাতক দিয়ে আমার জীবন নাশ করেন, আমি স্বইচ্ছায় মস্তক পেতে দিচ্ছি ! অনেক চেষ্টা করেও যে আমি মতের পরিবর্ত্তন করিতে পারি নি ! আমার মতের উপর নির্ভর করে,—এম্‌নি করে একজন নিরপরাধির জীবন নাশ কর্‌বেন ? আমি আপনার পুত্রবধূ ··· ।" আর বলিবেন না। একটা অসীম অবসাদের তাড়নায়, মতিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল !

কয়েক মুহূর্ত্ত জল সিঞ্চনের পর, মতিয়া অনেকটা প্রকৃতস্থ হইল। বাদসা সাহেব নিতান্ত বিস্ময়াহত ভাবে, নির্ম্মমের মতই ক্রোধ বিরস কণ্ঠে বলিলেন "তোমার এমনি ধারা উত্তর শুন্‌তে আমি একেবারেই ইচ্ছে করি না। তুমি স্বীকৃত কি না তা-ই- স্পষ্ট করে সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত কর ; আর পাঁচ মিনিট মাত্র সময় দিচ্ছি, এ-রি মধ্যে তোমার মতামত জানাতে হ'বে। তবে মনে রেখো,—হোসেন আলীর জীবন মরণ তোমার চূড়ান্ত মীমাংসার উপর নির্ভর কচ্ছে !"

উক্তি শ্রবণ করিয়া মতিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ যেন তাহার নিকট, একাকার হইয়া গেল ! জীবনের অসীম ব্যর্থতার ভীষণ নগ্নতা যেন, আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়া, তাহার অন্তরকে খান্ খান্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিতে লাগিল ! রুদ্ধ বাষ্প চাপে, ভূগর্ভের মতই বিদীর্ণ হইতে চাহিতে লাগিল, ছিঁড়েও না অথচ কাঁটেও না, এমনি ধারা উৎকট যন্ত্রণার সহনাতীত তাপে সে দগ্ধ হইতে লাগিল ! একটা নবোদ্ভব রোষে ও ক্ষোভে তাহার হৃদয়, প্রাণ, যেন ভীষণতর বিদ্রোহ হইয়া উঠিল ! মতিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল ! বাদসা সাহেব গভীর গর্জ্জনে বলিলেন "কোন মত প্রকাশ কর্‌বে না তুমি ? এতটুকুন বালিকার নিকট বাদসার ক্ষমতা, অক্ষমতায় পরিণত হবে ? না—তা-ত- হ তে দোব না ! যা সংকল্প তা' কার্য্যে পরিণত কর্‌বই, সামান্য মায়ার সংঘাতে তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটাতে দোব না !" অতঃপর বাদসা সাহেব হোসেন আলীর প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া বলিলেন "হোসেন ! তুমি মৃত্যুর জন্যই এ মুহূর্ত্তে প্রস্তুত হও,—ঘাতকের ঐ সুতীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে, তোমাকে জীবনলীলা শেষ কত্তে হবে,—ইহাই বাদসার আদেশ।" বাদসা সাহেব পর মুহূর্ত্তে ঘাতকের প্রতি তাকাইয়া,—বলিলেন "ঘাতক ! হুকুম তামিল কত্তে প্রস্তুত হও, আমার অঙ্গুলি সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গেই, তোমার কার্য্য সমাধা কত্তে হ'বে।"

বাদসার উক্তি শ্রবণ করিয়া হোসেনের প্রশান্ত ললাট মুহূর্ত্তের জন্য দীপ্ত শ্রীমণ্ডিত দেখাইল। আবার পর মুহূর্ত্তে সেই আনন্দ জ্যোতিকে, করাল-দুশ্চিন্তা-মেঘ-কবলে যেন ম্লান করিয়া দিল ! একটা গুরু ভারাতুর, অথচ অনুপায় হেতু ক্ষোভে জর্জ্জরিত, হৃদয় মন লইয়া হোসেন ক্রুদ্ধ ও ক্রুর কণ্ঠে বলিলেন "বাদসা সাহেব ! মতিয়া তা'র মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখ্‌তে, যা করা কর্ত্তব্য তা'র সব টুকুনই জগত সমক্ষে প্রকাশ করেছে ! তা'র অন্তরের ভিতর অসীম স্নিগ্ধ স্বর্গের মিলন পুণ্যজ্যোতি যে, বিরাজমান ছিল, তা এতদিন ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারি নি ! মতিয়াকে খোদা এমনি উপাদানে তৈয়ার করেছেন, যা'র উন্মাদনা শক্তিকে প্রলুব্ধ করাতে, বাদসার অতুলনীয় সম্পদাভবন নিতান্তই হীন ও অপতুল ! মতিয়ার মত রমণীকে জীবন সঙ্গিনী কর্‌তে গিয়ে, এ ভাবে মৃত্যুকে বরণ করাও শ্লাঘণীয় ! মৃত্যু সে-ত জীবনের শেষ পরিণাম ! সকলকেই একদিন বরণ কত্তে হবে ! এরজন্য ভীত শঙ্কিত হয়ে, অপরকে কর্ত্তব্য পথভ্রষ্ট করবার মত কামনা চিরদিনই বর্জ্জনীয় ! তবে বাদসা সাহেব ! অন্তরে অনেক কথা পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে—তা' ব্যক্ত করবার জন্য কয়েক মিনিট সময় দিতে হইবে। এ আবেদনও কি মঞ্জুর কর্‌বেন না বাদসা সাহের ?

ভীষণ ঝটিকার সময়, উন্মত্ত-নদীর-তরঙ্গগুলি শ্বেতফেণা উদ্গীরণ করিয়া, সর্ব্বনাশী হাসির মতই, মুখ ব্যাদন করিয়া, যেমন ঘোর আবর্ত্তে পতিত ভয়ার্ত্ত আরোহী বর্গের মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদকে ডুবাইয়া দিয়া, ক্ষুদ্র তরণীকে উন্মত্ত অধীরে অবলোকন করে, বাদসা সাহেব তেমনি জ্বালাময় অট্টহাসি হাসিয়া, অপ্রসন্ন ভ্রূভঙ্গীর সহিত বলিলেন "তোমার আবেদন মঞ্জুর করা গেল তবে বাদসার সম্মুখে সংযত ভাষায় যা বল্‌তে হয় বল্‌বে,— যদি রূঢ় বাক্যে কোন অবমাননা কত্তে

পারি না যে অশিক্ষিত অনাদৃত পল্লীকবিদের রচনায়ও এই প্রকার সুন্দর প্রেমচিত্র স্থান লাভ করিতে পারে।

আজও কত করুণ, প্রাণস্পর্শী প্রণয় গীতি পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষতঃ ময়মনসিংহের পল্লীতে পল্লীতে কৃষক কণ্ঠে বাজিয়া উঠে! এই সমস্ত গীতিকার আখ্যান বস্তুতে দেখিতে পাই কোন পল্লীবাসিনী তরুণীর মধুর পূর্ব্বরাগ, পর্ণকুটির বাসিনী অভিসারিকার অপূর্ব্ব প্রেমলীলা কিংবা কোন বিরহ-বিধুরা নবীনার অশ্রুমাখা উচ্ছ্বাস। সুরের মাধুর্য্যে, পদের লালিত্যে এবং সর্ব্বোপরি একটা "মন প্রাণ বিলিয়ে দেওয়ার" অপকট ভাব পরিস্ফুটনে এই অমূল্য পল্লী-গীতি লহরী যাবচ্চন্দ্র দিবাকর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিবে সন্দেহ নাই।

আজ আমরা এমনই একটী রসাল গীতিকার রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইব যে গীতের অন্তরালে এক প্রেমময়ী তরুণী যেন মূর্ত্ত প্রাণবন্ত হইয়া আমাদের মানস চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

* * * *

সরলা পল্লীবালা সে—"প্রেম" কথাটা পর্য্যন্ত কোন দিন শুনে নাই—কিন্তু এই নিরক্ষর যুবতীই অতীতের কোন এক পল্লীপথে তরুবীথিকার তলে দাঁড়াইয়া আপনার সমস্ত বিলাই দিয়া আকুল কণ্ঠে গাহিয়াছিল ;—

মইষও রাখ মইশাল বন্ধুরে
ক্ষীর নদীর পারে
অরণ মইষে খাইল খেত গো
বাইন্ধা নিব তোরে রে
পরাণ কান্দে মৈশাল বন্ধু রে।

এই 'মইশাল বন্ধু'টি জনৈক মহিষ রক্ষক—বলিষ্ঠ দেহ শ্যামকান্তি সুন্দর যুবক সে—গায়িকা তাহাকে গোপনে গোপনে ভালবাসিত ; আজ ঘটনাচক্রে সেই গোপন প্রেম প্রকাশ পাইবার পথ পাইল। এক আরণ্য মহিষ কে (অরণ মহিষ) গৃহস্থের শস্য ক্ষেত্রের ক্ষতি করিতে দেখিয়া সে তার মইষাল' বন্ধুর বিপদ আশঙ্কা করিল। বুদ্ধিমতী পল্লী যুবতীর এই আশঙ্কা অমূলক নয় ; কারণ গৃহস্থ আসিয়া যখন এই বন্য মহিষটীকে দেখিতে পাইবেন না তখন সে নিশ্চয়ই মনে করিবে অনতি দূরে যে মহিষ রক্ষক বাস করে তাহার মহিষেই শস্য নষ্ট করিয়াছে। কাজেই শাস্তি দিবার জন্য বা ক্ষতিপূরণ আদায় করিবার জন্য তাহার পরাণ বন্ধুরে বাইন্ধা নেওয়া' কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। তরুণী বোধ হয় তখন মহিষ রক্ষককে সাবধান হইবার জন্য এই গীত গাহিয়া গজেন্দ্র গমনে জল আনিতে গিয়াছিল ; কিন্তু জল লইয়া ফিরিবার পথে দেখিল সে ক্ষেত্রস্বামী তাহার প্রিয়তমকে আটক করিয়াছে। যুবতীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এই দৃশ্য সে তার প্রণয়োচ্ছ্বাস কেমনে চাপিয়া রাখিবে? যাহা এতদিন অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বহিতেছিল আজ তাহা কূল প্লাবিত করিয়া সাগর সঙ্গমে প্রধাবিত হইল। লজ্জা, ভয়, মান, অপমান কোন কিছুর বন্ধনই সেই স্রোতাবেগের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। বিপন্না নারী তাড়াতাড়ি কলসী ফেলিয়া ক্ষেত্রস্বামীর চরণে পতিত হইল এবং কাতর কণ্ঠে গাহিল :—

মাইরনা ধইরনা গিরস্তরে * (১)
হাতে না দিও দড়ি
হাতের পৈছা বেইচ্চা (২) দিবাম ত
অরুণ মইষের কড়ি রে
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে।

বন্য মহিষ গৃহস্থের যে ক্ষতি করিয়াছে তাহা পূরণার্থে সে তাহার 'হাতের পৈছা' বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রেমাস্পদকে বিপন্মুক্ত করিতে গিয়া সে আজ নিরাভরণা হইতেও কুণ্ঠিত নয়। এই যে ত্যাগ স্বীকার এবং প্রাণ ঢালা ভালবাসার সংবাদ উপরের গীতাংশদ্বয় হইতে পাইতেছি তাহার মাধুর্য্যকে পাড়গেঁয়ে বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না ; কারণ প্রেম যে স্পর্শ মণি!

* * * *

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কিরূপে মিটমাট হইল তাহার ঠিক খবর আমরা রাখি না। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অবলার কাতর অনুনয়ে, আকুল রোদনে পাষাণও গলিয়া যায়।

যাহা হৌক ঐ ব্যাপারের মীমাংসা হইবার পর, দিনের পর দিন যায় রূপসী পল্লীবাসিনীর প্রেম পিপাসা বারে বৈ কমে না। সে ভাবিল তাহার অন্তরের গুপ্ত-কথা যখন লোক জানা জানি হইয়া গিয়াছে তখন আর ইহা চাপা দিবার

* ১। গৃহস্থ ২। বিক্রয় করিয়া ৩। দিব।

বিফল চেষ্টা কেন? তবে আর লোকলজ্জার ভয় রাখিয়া কি হইবে? তাই একদিন মাঠের ধারে সে তাহার প্রিয়তমের সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে সাদর নিমন্ত্রণ করিল। যৌবনময়ী তাহাকে আপন বাটীর পথ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া বলিল ;—

আমার বাড়ী যাইও বন্ধু
এই না বরাবর।
উচা ভিটা কলার বাগ
পূব দুয়াইরা ঘর রে
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে।

তাহার পর বন্ধুকে সে কি বসিতে দিবে, কি খাওয়াইবে এবং কিরূপ আদর যত্ন করিবে পরের গীতাংশে তাহাই প্রকাশ করিল :—

আমার বাড়ী যাইও বন্ধু
বইতে দিব পিড়া ; :
জলপান করিতে দিবাম
শাইল ধানের চিড়া রে
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে।
শাইল ধানের চিড়া নারে
বিন্নি ধানের খই
গাছে পাকা সপ্‌রি কলা
গামছায় বান্ধা দই রে।
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে।

মইষাল বন্ধুকে সে প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবাসে কিনা, তাই সে গ্রাম-সুলভ সমস্ত উপাদেয় খাদ্যই বন্ধুর জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছে। প্রথমতঃ শাইল ধানের চিড়ার কথা বলিয়া পরক্ষণেই ভাবিল হয়ত এই জিনিষটা বন্ধুর মনঃপূত হইবে না। তাই পরপদে সে আপন ভুল সংশোধন করিয়া আরও উৎকৃষ্টতর খাদ্য বিন্নি ধানের খইএর কথা প্রকাশ করিল। গাছে পাকা সপ্‌রি কলা সব চেয়ে মিষ্ট এবং সুস্বাদু, খইএর সঙ্গে সেই কলাই দিবে। শুধু তাহাই নয়, সে নিশ্চয়ই জানিত যে "গব্যহীনং কুভোজনম্" তাই তাহার প্রিয়বন্ধুর জন্য দধির ব্যবস্থাও করিতে ভুলিল না। সেই দই আবার এত জমাট যাহা নাকি 'গামছায়' বাঁধিয়া রাখা যায়।

যুবতীর প্রত্যেকটী কথাই গভীর ভালবাসার পরিচায়ক ; কিন্তু যাহাকে এতগুলি কথা বলা হইল সে কেন একটী কথারও উত্তর দিল না—আমরা তাহার প্রাণের খোঁজ কেন পাইলাম না, এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই আমাদের মনে আসিতে পারে। প্রেমিকার এই মিলনোৎসবের নিমন্ত্রণে যুবকের মনেও যে প্রেমের প্রেরণা আসে নাই তাহা নহে, কিন্তু সে যেন আজ নীরব কবি! এই অচিন্তিত সুখের উদয়ে সে আজ মৌন, গম্ভীর হইয়া রহিল ; একটী কথারও উত্তর দিতে পারিল না।

* * * *

রজনী দুর্য্যোগময়ী। কালো মেঘগুলা সমস্ত আকাশটার বুক জড়াইয়া ধরিয়াছে। মিলনাশার নেশায় দাদুরীদল যেন মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছে। কিন্তু এরূপ বাদ্‌লা রাতেই না জানি কে চোখের ঘুম চুরি করিয়া লইয়া যায়, ক্ষণে ক্ষণে সেহ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রিয় মানুষটীকে মনে পড়ে। তাই বুঝি এমন দুর্য্যোগের রাত্রিও সেই মহিষ-রক্ষকের গুপ্ত অভিসারের পক্ষে কিছুমাত্রও বাধা জন্মাইতে পারিল না। প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধুকে এমন রাত্রে সঙ্কেত স্থানে উপস্থিত দেখিয়া নায়িকা বলিয়া উঠিল :—

মেঘ আন্‌ধাইরা (১) রাইত গো (২)
বাঘের বড় ভয়।
তুমি কেন আইলা বন্ধু
আমি গেলাম অন্য রে
পরাণ কান্দে মইষাল বন্ধুরে॥

শুধু প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ নয়, তখন আবার জঙ্গল ভরা সেই গ্রাম্য ব্যাঘ্রেরও উপদ্রব ছিল। যুবতী বন্ধুকে জানাইল যে এত কষ্ট করিয়া না আসিয়া একটু অপেক্ষা করিলেই আপন ঘরে তাহার দর্শন পাইত। যুবকের এই দুঃসাহসের সে তো প্রশংসা করিতে পারে না ; সে যে স্নেহময়ী, ভয়শীলা, নিতান্ত কোমল হৃদয়া পল্লীবালা! বন্ধু ব্যাঘ্রের কবলে পতিত হইলে তাহার যে দুঃখের সীমা থাকিবে না! প্রণয়ীর জীবন তাহার নিকট অমূল্য ধন! তাহার কাছে নিজের জীবন অতি তুচ্ছ! তাই সে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও বন্ধুর বাড়ী যাইতে প্রস্তুত ; কিন্তু তার 'মাথার কিরা'—বন্ধু যেন এমন রাত্রে ঘরের বাহির

সৌরভ :—

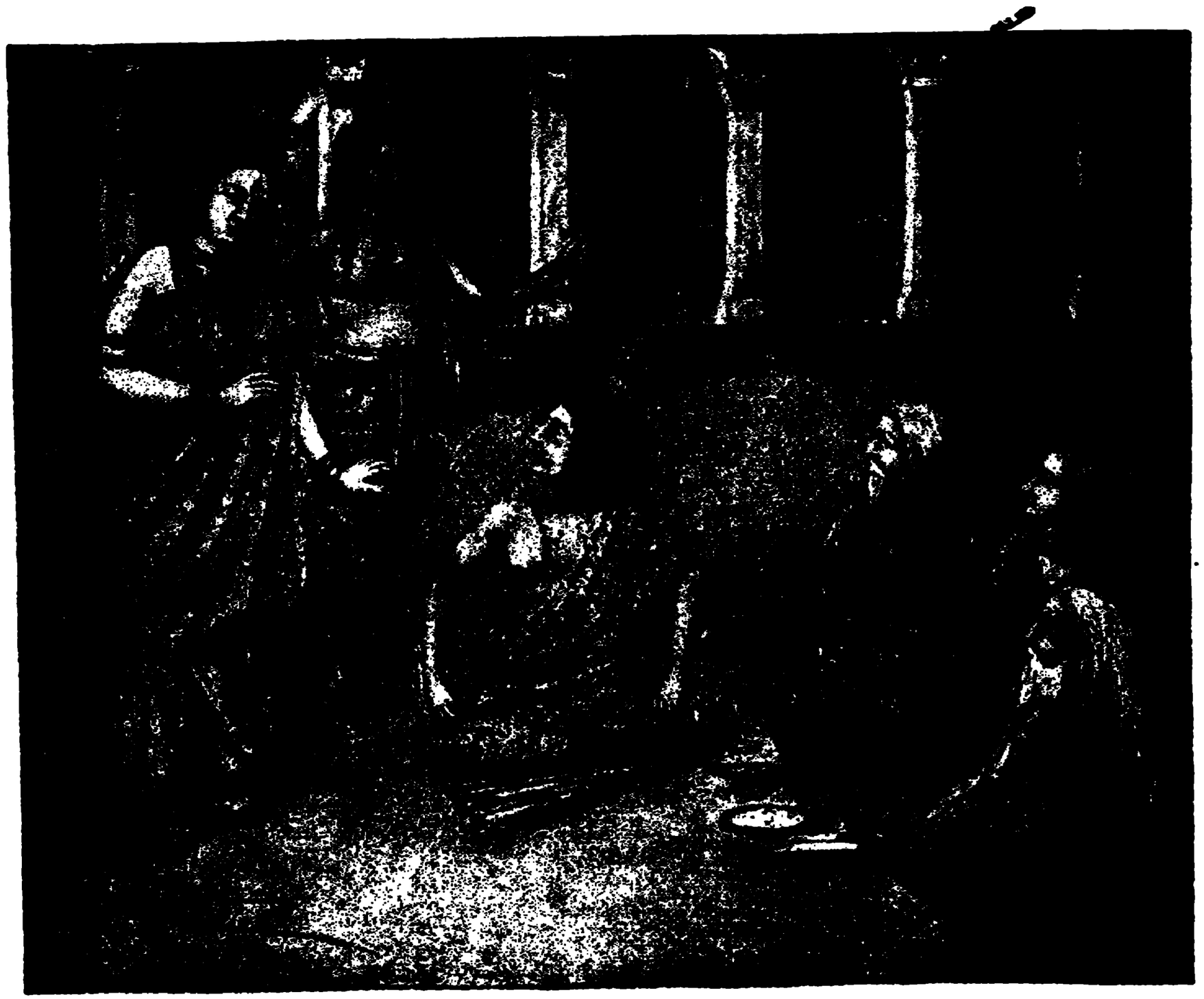

দক্ষযজ্ঞে সতী

যুগ-প্রবাহ

[শ্রীহীরেন্দ্রনাথ রায় এম্, এ]

অতি আধুনিক চিন্তা-জগতে জগৎ-রহস্যে মানবের স্থান নিয়া দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্যিকমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই আন্দোলনের উন্মাদনা সম-সাময়িক যুগের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই স্পর্শ করিয়াছে। এমন কি, বিশেষ বিশেষ মতবাদ সম্বন্ধে জটিল বিতণ্ডার উদ্ভব হইয়া আলোচ্য বিষয় ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগ যদি ভবিষ্যতের কাছে "rationalism"এর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহে, তবে এই যুগ-প্রবাহে তাহার "intolerance" নামক প্রবৃত্তিটি পরিত্যাগ না করিলে চলিবে না। কারণ এই অসহিষ্ণুতা অন্ধতারই নামান্তর। আজ মানুষ তাহার নূতন দৃষ্টিদ্বারা তাহার নিজের ও পারিপার্শ্বিক জগতের স্বরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে ব্যস্ত; সে এই জাগতিক বিবর্ত্তনের সংঘাত পরম্পরার মধ্যে নিজের উদ্দেশ্য, আদর্শ, এবং সার্থকতা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট এবং নিঃসন্দেহ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাহে। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ "personal equation" বিরহিত, compromiseless অর্থাৎ রফাশূন্য এবং খাটি বৈজ্ঞানিক সত্য হউক—এই তাহার ইচ্ছা। ইহার পক্ষে বাধা অনেক, এবং প্রত্যেক যুগেই এই প্রকার বাধা উপস্থিত হইয়া মানবের স্বাধীন সত্যানুসন্ধিৎসাকে ব্যাহত করিয়াছে। য়ুরোপীয় রেঁণাসেস্ tradition এবং conventionএর আবর্জ্জনা ধুইয়া মুছিয়া মনকে clean slateএ পরিণত করিতে সহস্র চেষ্টা করিয়াও সরিষার ভূত গোড়ামির গলদ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। তারই ফলে বর্ত্তমান যুগের চিন্তা-ব্যাপারে হয়ত বা একটু অত্যধিক উগ্রতা পরিলক্ষিত হইতেছে, হয়ত বা একটু অতিমাত্রায় Scepticism অর্থাৎ সন্দেহ-প্রবণতা প্রকাশ পাইতেছে। অজ্ঞতাজনিত আত্ম-সন্তোষ ভাবী বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় সর্ব্বপ্রকার পরিবর্ত্তন এমন কি নব নব গবেষণাকেও বর্জ্জন করিয়া চলিতে চাহে; কিন্তু তাই বলিয়া শান্তিকামী নীতিবিৎ সকল সময়েই ভাঙ্গনকে চাপা দিতে পারেন না। বর্ত্তমান প্রচেষ্টা বহুল পরিমাণে গোড়ামি বিবর্জ্জিত; এখানে আগে হইতেই unitarianism বা একমেবাদ্বিতীয়মের অবতারণা করিয়া বা কোনো accepted first principle এর দোহাই দিয়া সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করিবার আকাঙ্ক্ষা কম। এই যুগ প্রত্যেক তথ্যকেই সত্য বলিয়া মানিতে নারাজ। ইহা সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষা বা experimentএর যুগ। এখানে বিশেষ কোনো গবেষণা বা মতবাদকে মাত্র স্বীকার বা অস্বীকার করিয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দিলে অন্যায় জবরদস্তি করা হইবে। তাহারা ভাল কি মন্দ সে বিচার এখন নয়। কালের কষ্টিপাথরে তাহাদের স্বার্থকতা অনির্দ্ধারিত থাকিবে না।

এখন কথা হইতে পারে মানবের এই স্বরূপ সন্ধানের আবশ্যকতা কি? তাহার প্রাত্যহিক জীবনে তাহাদের মূল্য কি? ইহার উত্তর,—মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাবই এই। মানুষ বা তাহার সমাজের গঠন ও বর্দ্ধন রীতি প্রায় একই রকম। উভয়ের জীবনই ভিতর এবং বাহিরের নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া নিজের অজানিতে তিলে তিলে গড়িয়া উঠে। কিন্তু বিবর্ত্তন ক্রমানুসারে যেই মুহূর্ত্ত হইতে আত্মচৈতন্য বা Self-consciousess এবং Social self consciousess জন্মলাভ করে তখন হইতেই এই পশ্চাৎ পর্য্যবেক্ষণ অর্থাৎ Retrospective viewএর সূচনা দেখা দেয়। ইহা মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট। পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে আজ পর্য্যন্ত যত রত্ন-সম্ভার সঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহাদের সকলের অফুরন্ত উৎসধারা এইখানে। দৃষ্টিতে এই আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রশ্ন নিয়াই মানুষের জ্ঞান-নয়ন প্রথম উন্মীলিত হইয়াছিল, এবং যুগযুগান্তর ধরিয়া তাহার শেষ প্রশ্নটি আজিও শেষ হয় নাই। বিজ্ঞান, দর্শন, এবং সাহিত্য মানব-মনের মুকুর। তাহাতে তাহার প্রত্যেক প্রশ্ন, প্রত্যেক চিন্তা, উদ্বেগ, সন্দেহ, মীমাংসা নিশ্চিত ভাবে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং তাহাদের ধারাবাহিক আলেখ্য পর্য্যালোচনা করিলে নিরপেক্ষ সমালোচক গোড়ামির আবর্ত্ত হইতে মুক্ত হইয়া উদারতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন।

কিছুদিন হইল বার্লিনে আন্তর্জাতিক ছাত্র-সম্মিলনে জনৈক ছাত্র মনীষি বার্ণার্ড'শকে প্রশ্ন করিয়াছিল যে ইদানীং তিনি মনুষ্যত্বে আস্থা হারাইতে আরম্ভ করিয়াছেন কিনা।

তদুত্তরে তিনি বলেন "Who said, I had ever any" ? যে মনুষ্যত্বের মাপকাঠি প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, ব্যক্তি বা জাতির উত্থান পতন, আর্থিক অবস্থা, এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল, যাহার নিজস্ব চিরন্তন কোন সংজ্ঞা নাই তাহার উপর আস্থা না থাকারই কথা বটে। কথাটা বিশেষভাবে অনুধাবণযোগ্য। আমরা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছি মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর নিজের স্থান নির্দ্দেশ করিতে চায় নিতান্তই তাহার সহজ প্রেরণার বশে। এই চেষ্টা তাহার ব্যক্ত ও অব্যক্ত সাধারণ action reactionএরই অন্তর্ভুক্ত। ইহা দ্বারা সে সদা বিবর্ত্তমান বহিঃপ্রকৃতির ঘাত সংঘাতের সঙ্গে নিজের ইন্দ্রিয়-নিচয়ের এবং আশা আকাঙ্ক্ষার একটা সামঞ্জস্য সাধন করিতে চায়; কারণ এই সামঞ্জস্য না হইলে তাহার জীবন চলা ভার হইয়া উঠে। নিজের এবং জাতির রক্ষার জন্য ইহা নিতান্তই চাই বলিয়া এই রক্ষার চেষ্টা এত অবশ্যম্ভাবী, এত বিশ্বব্যাপী। আমরা আমাদের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্রবৃত্তিদ্বারা দেশ-কাল-সীমাহীন অনির্দ্দিষ্ট প্রকৃতিকে (Indeterminate mass of external Nature) নির্দ্দেশ করিয়া, সংজ্ঞা দিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিয়া তুলি। সেই হইতে নূতন লব্ধ বস্তু আমার হয়, আমি আমার আমিত্বদ্বারা তাহাকে আলোকিত করি, আবার সেই বস্তু আমার আমিত্বে সংযোজিত হইয়া আমার চৈতন্য জগতের প্রসার বাড়াইয়া দেয়। আমার এই define করিবার প্রবৃত্তি আমার প্রকৃতিগত সহজ সংস্কার। আমি আমার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, স্পর্শশক্তি বা মনন-শক্তি দ্বারা বহিঃপ্রকৃতি হইতে যতটুকু carve out করিয়া নিতে পারি ততটুকুই আমার জগৎ। আমার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার জগৎ বাড়িয়া চলিতেছে, আমার আমিত্বকেও বাড়াইয়া তুলিতেছে। আমার চৈতন্যরূপী Search light এর নিক্ষেপ ক্রমানুসারে আমার আবিষ্কৃত জগতের পরিসর যেমন বর্দ্ধিত হইতেছে ঠিক তেমনি নবালোকিত ভুবনও আমার সঙ্গে একীভূত (unified) হইয়া আমার আমিত্বের পরিধি বাড়াইয়া তুলিতেছে।

এবম্বিধ জ্ঞানের সত্যাসত্যের চরম মীমাংসা করা অতীব দুষ্কর। সাধারণ চোখে অর্থক্রিয়াকারিত্বই তাহাদের সত্যতার প্রমাণ অর্থাৎ যেমন জলকে জল বলি তাহার পিপাসা-নিবারণ-সামর্থ্য দেখিয়া। কিন্তু জ্ঞাতাজ্ঞেয়নিরপেক্ষ ধ্রুব শাশ্বত সত্যের মূর্ত্তি কেমন তাহা আজ পর্য্যন্তও আমাদের জ্ঞানের সীমা বহির্ভূত। এই কারণেই আমাদের জগৎ এত ভাবদ্বৈধতায় (conflict of tendencies) পরিপূর্ণ। এই অনন্ত কোলাহলের মধ্যে অন্ততঃ এইটী ঠিক যে কাল-প্রবাহ অতি খরবেগে নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে; তাহার গতি উদ্দাম এবং অপরিবর্ত্তনীয়। প্রত্যেক বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত প্রতিপলকে অতীতের গর্ভে লয় পাইতেছে, আবার ভবিষ্যতের দিকেও ঝুঁকিয়া পরিতেছে,—যেন একটী বিনি সূতার মালা, একটী ফুল অপরের গর্ত্তে স্থান লইতেছে, আবার নিজের গর্ত্তে পরেরটীকে গ্রহণ করিতেছে। প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত যেন এক একটী ক্ষণস্থায়ী সঙ্গম-ক্ষেত্র,—বর্ত্তমানের সঞ্চার মাত্র অতীতে পরিণত হইয়া ভবিষ্যতের দিকে উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে। এই ভাবে মহাকাল অনন্ত গতিবেগে আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন, কেন, কি উদ্দেশ্যে কেউ জানে না। এই অতিক্রত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাল রাখা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয় বলিয়াই সে মহাকালকে বিকৃত স্থূলরূপে দেখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু যতক্ষণ সে মরাকালের স্থূল দেহ নিয়া ব্যস্ত ততক্ষণে স্রোত কোন্ দেশে বহিয়া চলিয়াছে কে জানে? প্রত্যেক যুগই এই গতিকে বাদ দিয়া স্থূল ও স্থাণুর উপাসনা করিয়া ঠকিয়াছে, এবং সত্যতা আবর্জ্জনার জঞ্জালে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই গতিবেগকে অস্বীকার করে বলিয়াই এক-যুগ অন্য যুগের শাসক এবং সংরক্ষক হইবার স্পর্দ্ধা করিয়াছে, একযুগের চিন্তাবীর অন্যযুগের সত্যদ্রষ্টা বলিয়া মিথ্যা ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক যুগের প্রশ্ন ও উত্তর, সমস্যা এবং সমাধান সম্পূর্ণই তাহার নিজস্ব। অন্যের তাহা dictate বা সমাধান করিবার চেষ্টা যেমন ভ্রান্ত এবং অসম্ভব, তেমনি যুগ বিশেষের তথ্যকে সর্ব্বকালের মনে করিয়া নিজের দেখাই-বার চেষ্টাও একান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

প্রথম গ্রীসীয় বৈজ্ঞানিক দার্শনিক থেলি বা প্রথম আর্য্যঋষির বেদ সংযোজনা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের বার্গসো, আইনষ্টাইন, আলেক্‌জান্দার বা রাসেল পর্য্যন্ত জগৎ ব্যাপার সম্বন্ধে বহুবিধ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মতের অভাব নাই।

কায়িক-সংমিশ্রণ যৌন হিংসার আবর্ত্তে পড়িয়া যখন দৈব বিবাহে রূপান্তরিত হয়, সতীত্বের জন্মকথা হয়ত বা তখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। হয়ত বা প্রবলতর পক্ষ অপরকে সম্পূর্ণ নিজের আওতায় রাখিবার জন্য নীতিবাক্যের সুদৃঢ় বেড়া রচনা করিয়াছে। আজিকার জগৎ তাই নূতন করিয়া বিবাহ ও সতীত্বের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সার্থকতা খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টিত হইয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে—সতীধর্ম্মে ও পতিধর্ম্মে তাফাৎ কি? পুরুষের বেলায় সদ্ধর্ম্ম প্রযোজ্য কি না? স্ত্রী পুরুষের অবাধ প্রেম বৈধ কি অবৈধ? এই সমস্ত সমস্যার উত্তরে বিভিন্ন প্রকারের গবেষণার উদ্ভব হইয়াছে। কেহ বা morality কে নিছক convention এবং enlightened self-interest বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। অপর কেহ নৈতিকতা এবং বিবাহের একত্রীকরণ সভ্যতার একটা বিষম ভুল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—"The confusion of marriage with morality has done more to destroy the conscience of the human race than any other single error" বিবাহ যে বেশীর ভাগ লোকে পছন্দ করে তাহার কারণ নাকি combination of maximum of temptation with maximum of opportunity" আজ নারী শুধু পুরুষের পছন্দসই খেল্‌না হইয়া থাকিতে পছন্দ করে না। "living by playing tricks for him" আর স্ত্রীর স্বাধীনতা স্পৃহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছে না।

উপরন্তু বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান তাহার গবেষণার ফল পুস্পাদি দ্বারা নূতন নৈতিক মত সংগঠনের সহায়তা সম্পাদন করিতেছে। ফ্রয়েডিয়ানিজ্‌মের নাম আজ সভ্য জগতে কাহারও অবিদিত নহে। তাহাদিগের এবং পরবর্ত্তী নিয়ো-ফ্রয়েডিয়ান্‌দিগের সিদ্ধান্তগুলি সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন যৌন নীতির (Sexual Ethics) জন্ম দিতেছে। মানুষের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত কার্য্যাবলী তাহার নিরুদ্ধ গ্রন্থির (repressed complexes) স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক প্রকাশ মাত্র। সুতরাং প্রত্যেক মানুষ মূলতঃ স্নায়বিক রোগগ্রস্ত (neurotic)। Libidoর সহজ প্রকাশেই জীবনের পরম চরিতার্থতা; কিন্তু বর্ত্তমান আট-ঘাট-বাধা কৃত্রিম সভ্যতাই ইহার পক্ষে সব চেয়ে বড় বাধা। মানুষ এইজন্য আদিম libido কে নিরোধ করিতে বাধ্য হয়, কাজেই তাহার বিকৃত কার্য্যাবলীর জন্য সে খুব বেশী দায়ী হইতে পারে না। অপরদিকে আমেরিকান নিয়োরিয়ালিষ্ট মনস্তত্ত্ববিৎগণ 'ব্যবহারবাদ' (Behaviourism) নামে এক নূতন পন্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাদের মতে মানুষ একটি প্রতিক্রিয়া পরায়ণ মেসিন্ ভিন্ন কিছু নহে, এমনকি প্রেম ভালবাসাও শারীর যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া মাত্র। তাহাদের মুখপাত্র Prof. watson একান্ত স্পর্দ্ধার সহিতই আশা করেন যে শীঘ্রই জগতে এক নূতন নীতিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার নাম Behaviorist Ethics. তিনি তাহার ল্যাবরটরিতে চোর, বদমাইস বা প্রতিভাশালী, ইচ্ছামত সৃষ্টি করিতে পারিবেন। আত্মবাদ বা পাপবাদ উভয়ই উঠিয়া যাইবে। মানুষ জন্ম সাধুও নয়, জন্ম পাপীও নয়, তাহার ব্যক্তিত্ব তাহার পারি-পার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা 'conditioned' হওয়ার উপর নির্ভর করে। আসল কথা এই যে ধর্ম্মনীতি কোনো 'Ultimate good' বা চরম সত্যের দিকে উন্মুখ হইয়া থাকিবে না, পরন্তু বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া সমাজস্থ নরনারীর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া চলিবে।

আজিকার সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে এই জাতীয় জটিল সমস্যা একান্তভাবে দেখা দিয়াছে এবং সমুদয় চিন্তাশীল-জগৎ নিরতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত ইহাদিগের সমাধানকল্পে মনোযোগী হইয়াছে। এই বিভিন্ন 'স্কুলের' সিদ্ধান্তগুলি আজই বিচার করিবার সময় আসে নাই। কোনও বাঁধা-ধরা Presupposition অথবা গোড়ামির দোহাই দিয়া কোন মতকে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা intellectual intolerence প্রকাশ করিবে মাত্র। আজকাল আমাদের দেশে এ বিষয় নিয়া মাতামাতি বৈধতা ও শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় কিছুই হইতে পারে না। চিন্তা-জগতে এইপ্রকার impeachment অনেকটা অহেতুক ও অনাবশ্যক। যাহা নিতান্তই কুফলপ্রসূ তাহা সমাজের sanction অভাবে আপনিই খসিয়া পড়িবে।

সুসঙ্গে শিকার

[মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি, এ]

শিকারের স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গেলে অনেকেই হয়ত নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন। কিন্তু, মল্লযুদ্ধ, ফুটবল খেলা, Dagger খেলা, লাঠি খেলা, Boxing প্রভৃতি ক্রীড়ার স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গেলে যদি কাহারও আপত্তির কারণ না থাকে, তাহা হইলে শিকার সম্বন্ধে ইহার ব্যতিক্রম কেন হইবে, তাহা বুঝা যায় না। শিকার কিম্বা মল্লযুদ্ধাদি আধ্যাত্মিক পথের পথিকদের সহায়ক নহে—ইহা গোড়াতেই স্বীকার করি—সুতরাং শিকারের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিবার উপহাসাস্পদ প্রচেষ্টা করিব না। শরীরকে কার্য্যক্ষম করিয়া রাখার পক্ষে যে সকল sports সহায়ক হয়; এবং সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অবনতির কারণ না হয় ও মানসিক আনন্দদায়ক হয়, সেই সকল sportsই মানব সমাজে আদরণীয় স্থান পাইয়া আসিতেছে। এই হিসাবে শিকারের স্থান অন্যান্য sports অপেক্ষা নিম্নে হইবার কারণ দেখা যায় না। বস্তুতঃ এতাবৎ-কাল পৃথিবীতে যত প্রকারের sports উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে শিকার একটী প্রধান। অবশ্য অতি আধুনিক Camera দ্বারা শিকারকেই আবার শিকারের রাজা বলা যাইতে পারে। ইহাতে Rifleএ শিকারের যাবতীয় অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়, অধিকন্তু প্রাণীহত্যাজনিত অবশ্য-লভ্য গ্লানিটুকু আর থাকে না।

"মেদশ্চেদ কৃশোদরং লঘু ভবত্যুৎসাহ যোগ্যং বপুঃ।
সত্বানামপি লক্ষ্যতে বিকৃতমচ্চিত্তং ভয়ক্রোধয়োঃ।
উৎকর্ষঃ সচ ধন্বিনাং যদিষবঃ সিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে
মিথ্যা হি ব্যসনং বদন্তি মৃগয়ামীদৃগ্ বিনোদঃ কুতঃ॥"

শিকারের স্বপক্ষে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী স্মরণীয়।

যদি প্রত্যেকটী জন্তুর স্বভাবাদি সম্বন্ধে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কেহ প্রবন্ধাদি রচনা করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং বাঙ্গালীর গৌরবের কারণ হয়। আরণ্য পশ্বাদির স্বভাব সম্বন্ধে বাঙ্গালীর মৌলিক পর্য্যবেক্ষণ ফল, প্রণালীবদ্ধ ভাবে লিখিত বড় একটা হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ২।৪টী পুস্তক যাহা পাঠ করিয়াছি, সেগুলিতে মৌলিক পর্য্যবেক্ষণ ফল অতি সামান্যই লক্ষ্য করা যায়—ইংরাজী লেখকগণের লিখিত অভিজ্ঞতার ফলগুলিই অনেক সময় পাওয়া যায়। ইহাতে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইলেও জাতির কৃতিত্বের পরিচয় কমই পাওয়া যায়। আশা করি শিক্ষিত শিকারীর মনোযোগ এই বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে এবং বাঙ্গালীর মৌলিক পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই সকল জীবজন্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য আরণ্য পশুপক্ষীর স্বভাবাদি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ মূলক বিশদ আলোচনায় বাঙ্গালীর অনেক বাধাও আছে।

এতদঞ্চলে শশক, বাঘভাঁস, বনবিড়াল, খাটাস, শৃগাল বৃহৎ সর্প, কদাচিৎ বর্ষাকালে কুম্ভীর, যজ্ঞশূকর, সজারু, প্রভৃতি নানা প্রকার ছোট ছোট জন্তু পাওয়া যায়। গারোপাহাড় অতি নিকটে থাকায় বন্য কুকুর, গবয়, এবং রিয়া, হঠাৎ কখনও পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন নানাজতীয় হাঁস, সারস শ্রেণীর পক্ষী, snife, বক জাতীয় পক্ষীর বটের, চৌরস, পাঁচ প্রকারের ঘুঘু, দুই জাতীয় হরিকল, বন্য কুক্কুট, দ্রোণ, উল্লাময়ুর প্রভৃতি বহু শ্রেণীর শিকার যোগ্য পক্ষা পাওয়া যায়।

কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসর সময়ে কেবলমাত্র সহজ লভ্য আমোদ আহ্লাদের জন্য বিলাসিতার কেন্দ্রস্থান সহর-গুলিতে না যাইয়া কোনও কোনও বৎসর প্রকৃতির লীলা নিকেতনের অনাবিল উৎসবে যোগদান করিলে একদিকে যেমন নূতন অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হইবে, অপর দিকে তেমনই প্রকৃতির সন্তানদের আনন্দের স্বাভাবিক বিকাশ ভঙ্গিমা দর্শনে নয়ন-মন পরিতৃপ্ত হইবে।

Christmasএর ছুটীই শিকার Campএ যোগদান করিবার শ্রেষ্ঠ সময়।

শিকারে হত্যাব্যাপার সংসৃষ্ট থাকায় যদিই বা তাহা সকলের নিকট রুচিকর নাই হয়, তথাপি—

".....নিখিলের সেই
বিচিত্র আনন্দ যত এক মুহূর্ত্তেই
একত্র করিয়া আস্বাদন, এক হ'য়ে
সকলের সনে.....' অনুভব করিতে

হইলে Shikar campএ যোগদান বাঞ্ছনীয় নহে কি?

বসিয়া রহিল। শেষে বিস্ময় স্তব্ধ নেত্র, দৌলতের চোখের উপর সংন্যস্ত করিয়া, কৌতূহলমাখা করুণকণ্ঠে বলিল "দৌলত! কি মনে করে এ সময় এলে?"

প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া দৌলতন্নেছা যেন মুসড়িয়া পড়িল। একটা জ্বালাভরা অসীম অস্বস্তির সংঘাতে, তাহার অন্তরটা যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল! সে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া অতি কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইল। শেষে শরীরের সমস্ত শক্তি যেন একত্র জড় করিয়া, দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিল "প্রিয়তম! এরূপ প্রশ্ন আজ তোমার নিকট নূতন শুন্‌লেম, আরও অনেক দিন ত আমি এমনি সময়ে এসেছি কৈ তুমি ত কোন দিনই এতটা থতমত খেয়ে, এভাবে প্রশ্ন কর নি! মানুষ যখন অভাবনীয় বিপদে পড়ে—উদ্ধারের পন্থা খুঁজে বেড় কত্তে পারে না, তখন সে সামান্য একটা সূক্ষ্ম-তন্ত্রী শেষ অবলম্বন করে, বিপদ স্খলনের, শেষ চেষ্টা করে থাকে! আমারও আজ সে অবস্থা, আমিও একটা মিথ্যা আশায় হয় ত—তেমনি কিছু কত্তে অগ্রসর হয়েছি। মনে মান্‌ছে না, তাই আজ মান, অভিমান বিদায় দিয়ে, তোমার অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইতে সাহসী হয়েছি। তুমি সবই জান,—তবু এম্‌নি ধারা প্রশ্ন করার অর্থ,—আমার মনে হয়, উত্তপ্ত অগ্নিতে ঘৃত সিঞ্চন করে, তার প্রচণ্ড তাপ বর্দ্ধিত করার প্রয়াস ছাড়া,—আর কিছু নয়ই! এতে যদি তুমি তৃপ্তি পাও,—তাও মনে করব তোমার অসীম দান,—মাথা পেতে নিবই!"

সাহাজাদা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল "দৌলত! আমাকে ক্ষমা কর। পূর্ব্ব স্মৃতি সব ভুলে যাও, বাবা যেভাবে আমাদিগকে পরিচালনা কত্তে চাইছেন,—তাইত মাথা পেতে নিতে হ'বে। এর ব্যতিক্রম ঘটাবার উপায় নেই ই। তবে মিছামিছা কেন,—এম্‌নি ভাবে অশান্তির সৃষ্টি করে শরীরের স্বাস্থ্য নষ্ট কচ্ছ? হোসেন আলী সুপুরুষ,—বিদ্বান লোক। সৎপাত্রেই তোমাকে অর্পণ করার ব্যবস্থা হয়েছে।"

দৌলতন্নেছা সাহাজাদার দৃঢ় অভিব্যক্তিতে, একেবারে ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, সে নিতান্ত উন্মাদের মতই,—ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিল। অতি কষ্টে কয়েক মিনিট কাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অন্তরের প্রচণ্ড বিপ্লব গোপন রাখিতে সচেষ্ট হইল। শেষে নিতান্ত সহজ ও দৃঢ়তা ব্যঞ্জক স্বরে বলিল "প্রিয়তম! তুমি—তুমি আজ এমনি ভাবে আমাকে প্রবোধ দিতে,—এতটুকুন কুণ্ঠা বোধ করনি? তুমিই ত শিখিয়েছিলে,—স্ত্রীলোক যাঁকে একবার স্বামীরূপে বরণ করে, তিনিই তা'র জীবনদেবতা রূপে চিরকাল বিরাজমান থাকেন,—বাছাই করা জিনিষটা ভালবাসা রাজ্যের ভিতর একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার!—সেই তোমার মুখে এ ধরণের উপদেশ আজ যেন কেমন শুনাচ্ছে!—সুন্দর ও বিদ্বান, এ মাপকাঠী নিয়ে যদি স্বামী গ্রহণ করার সুনিয়ন্ত্রিত পথ আবিষ্কৃত হয়, তবে আমার মনে হচ্ছে, একমাত্র তাদেরই স্ত্রী সংগৃহীত হওয়া উচিত,—ভালবাসা জিনিষটা একমাত্র তাদেরই একচেটে সম্পত্তি হওয়া উচিত,—যা'রা সুন্দর ও বিদ্বান বলে খ্যাতি অর্জ্জন করেছে! কিন্তু তা'ত প্রণয় রাজ্যের নিয়ম নয়—মনের অসীম টানের উপরই এর ভিত্তি সুগ্রথীত!—আমি তোমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছি, তোমার স্নেহ লাভ করবার সুবিধা তুমিই আমার করায়ত্ব করিয়েছ,—এখন তুমি তা ফিরিয়ে নিতে চাইলেও, সে অমূল্য দান পরিত্যাগ করার উপায় ত আমার নেই। তুমিই আমার উপাস্য ও কাম্য! চিরকাল তুমি তাই থাক্‌বে,—আমাকে বিলিয়ে দেবার প্রবৃত্তি তোমার অন্তরে জাগরিত হলেও, আমার অন্তরে সেরূপ কোন ভাব ত স্থান পেতে পার্‌বে না! বাদসা সাহেবের ইচ্ছায় এর কোন ব্যবস্থাই ত হয় নি। তোমার একান্ত ইচ্ছার উপর না এত বড় অভাবনীয় ব্যাপারের অনুষ্ঠান চল্‌ছে!—তোমার মত পরিবর্ত্তন করে দেখ,—সব গোলযোগ এক মুহূর্ত্ত মিটে যাবে। তোমার মতের উপরই ত আমার সুখ, শান্তি,—ইহকাল পরকাল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কচ্ছে! বল—তুমি আমারি থাক্‌বে? আমাকে এমনি করে অপরকে বিলিয়ে দিবে না?"

বর্ষায় নদীর বুক যখন ভরিয়া উঠে, তখন সে নিজের কল্‌ কল্‌ তানেই ভরপুর হইয়া বহিয়া চলে। অপরের কথা ভাবিবার সময় সে পায় না। সাহাজাদারও সেই অবস্থা হইয়াছিল। সে ক্ষণিকের জন্য,—লজ্জার গাঢ় রক্তিমায় রঞ্জিত হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, ক্ষুণ্নকণ্ঠে বলিল "আমার মন যাকে পাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে, যাকে পাবার জন্য আমি উন্মত্ত

হইল। একটা প্রবল আত্মগ্লানি ও মর্ম্মান্তিক ধিক্কার সে আপনার ভিতর অনুভব করিল! তাহার মনে হইতে লাগিল এমনি ভাবে তা'কে লাঞ্ছিত না করে, নির্ম্মমভাবে বেত্রাঘাত কর্‌লেও তা'র পক্ষে এত বড় নিদারুণ ও অসহনীয় হ'ত না। .....তাহার হৃদয়-বীণা যেন, এই বাক্য-বাণের কঠোর আঘাতে,—একেবারে ছিঁড়িয়া পড়িল। সে স্তব্ধ-অসাড়-বেদনা-পাণ্ডুর মুখে—ঈপ্সিতের মুখের প্রতি আহত নেত্রে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। শেষে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিল। একটা অব্যক্ত ব্যথা মুহুর্মুহুঃ তাহার ভিতরটা ফাঁটাইয়া দিবার জন্য, অসীম বেগে পীড়ন করিতে লাগিল! দৌলতন্নেছা অতি কষ্টে অশ্রু দমন করিয়া, রোদন রুদ্ধ স্বরে, সকাতরে বলিল "স্ত্রী চরিত্রের যে টুকুন উপলব্ধি করে,—তুমি আজ বিশেষজ্ঞ সাজতে চাইছ, আমার মনে হয়, তা'র আগা-গোড়াই, বৈচিত্র্যপূর্ণ ভ্রমাত্মক ছাড়া আর কিছু নয়-ই! আশৈশব তোমার ছায়া অনুগমন করেই চল্‌তে চেষ্টা করেছি, এতটা মাখামাখির সংস্পর্শে এসে, তুমি যদি, আমার ভিতর সেরূপ পূতিগন্ধময়, কোন বিশেষত্বের সন্ধান পেয়ে থাক, তবে সে-টা হয়ত, আমার সময়োচিত নিতান্ত দুরদৃষ্টের ফল বলেই ধরে নিতে হবে! তবে আমার অন্তর নিহিত, যা কিছু আছে, তা' যদি বিশ্লেষণ করে দেখাতে পার্‌তুম, তবে দেখতে, আমার অন্তরের প্রতি পর্দ্দায়, তোমার মোহন ছবি অঙ্কিত রয়েছে! সেখানে আর কোন কিছুর স্থান হবার সম্ভাবনা নেই! একমাত্র, স্বামী বিরহে উন্মত্তাধীর স্ত্রীলোকই মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম হয়ে থাকে, কিন্তু স্ত্রীর জন্য পুরুষ, প্রাণত্যাগ করেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত, ইতিহাসের পাতায় খুবই কম। মৃত্যু,—সেত অতি তুচ্ছ কথা! এত বড় অভিসম্পাত মাথায় তুলে নিয়ে, জীবন ধারণ করার চেয়ে, আমার পক্ষে, মৃত্যুকে বরণ করাটা কি খুবই লোভনীয় নয়? যে অসীম জ্বালা বুকে করে—জীবন ধারণ কচ্ছি, তার পরিসমাপ্তি খুঁজতে গেলে, মৃত্যুই যেন, একমাত্র শান্তিলাভের প্রশস্ত মুক্ত-পথ বলে মনে হচ্ছে! অনেক আশা করেই আজ তোমার নিকট এসেছিলুম, এ ভাবে, এতটা শেল বাক্য তুমি প্রয়োগ কর্‌বে বলে যদি ধারণা কত্তে পাত্তুম, তবে হয়ত তোমাকে বিরক্ত কত্তে কখনও আসতুম না, আমার অপরাধ ভুলে যাও, ক্ষমা করো, আর যেন তোমার কোন কাজেই প্রতিবন্ধক সেজে, তোমার সুখের-পথে কণ্টক বিস্তৃর্ণ না করি। এতটুকুন শক্তি কি খোদা আমাকে দিবেন না? এ দাসীকে যদি কোন দিন, মনে করবার অবকাশ হয়, তবে ভেবে দেখো, কত বড় মর্ম্মন্তুদ যাতনা নিয়ে আজ তোমার নিকট এসেছিলুম, আর কত বড় আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে, আমার এই অভিশপ্ত জীবনের লীলা সাঙ্গ করবার সংকল্প নিয়ে, তোমার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ কচ্ছি! না—আর ত পারি না, বিদায়—বলিয়াই দৌলতন্নেছা পাগলিনীর ন্যায় সে স্থান পরিত্যাগ করিল!

দৌলতন্নেছা বাহিরে আসিয়া, একাকী দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া ক্রন্দন করিল। শেষে ত্বরিত পদে আমিনার শয়ন কক্ষেরদ্বার প্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। অদূরে প্রহরী তরবারি হস্তে পদচারণা করিতেছিল, দৌলতন্নেছা তাহার প্রতি দৃষ্টি ঘুরাইয়া বলিল "প্রহরি! দ্বার খুলে দাও, আমি ভিতরে যাব।"

প্রহরী করযোড়ে, নত জানু হইয়া, বিনম্রকণ্ঠে বলিল "সহাজাদি! ভিতরে প্রবেশের হুকুম ত কারো নেই, বড়ই কড়া আদেশ, গর্দ্দানা যাবার ভয় ত আমার রয়েছে।"

দৌলতন্নেছা মাতালের মত টলিতে টলিতে, বাষ্পার্দ্রকণ্ঠে বলিল "কোন ভয় নেই প্রহরি! আমি হুকুম দিচ্ছি, সব দোষ আমিই মাথায় করে নিব। দ্বার খুলে দাও। পনর মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরে যাব।"

প্রহরী দৌলতন্নেছার মনের অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করিল। একটা অসীম সহানুভূতিতে তাহার অন্তর ছাইয়া গেল সে আর কোনই প্রতিবাদ না করিয়া, নিজ দায়ীত্বে, দরজার অর্গল মুক্ত করিয়া দিল। দৌলতন্নেছা কক্ষে প্রবেশ করিতেই, প্রহরী আবার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

দৌলতন্নেছা কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, উপর হইয়া পড়িয়া, আমিনার বক্ষে দেহভার সংন্যস্ত করিল,—এবং অজস্র অশ্রু প্লাবনে তাহার বক্ষসিক্ত করিয়া, উন্মুক্ত উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। আমিনা দৌলতের অভাবনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, একেবারে হতভম্ব বনিয়া গেল! একটা বুক ফাঁটা আর্ত্তনাদে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল! বিরক্ত-

তিক্ত-হতাশ-চিত্ত লইয়া আমিনা বহু চেষ্টায় তাহাকে অনেকটা শান্ত করাইয়া, সমস্ত ঘটনার সারমর্ম্ম টুকুন সংগ্রহ করিয়া লইল। আগামী কল্য, কাজী সাহেবের অজ্ঞাতসারে মতিয়াও সাহাজাদার উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করান হইবে, এই সংবাদে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। একটা অবসাদে তাহার সমস্ত দেহ, মন সহসা যেন একেবারে শিথিল হইয়া গেল! আমিনা ভাবিতে লাগিল—এ বিবাহের পরিণাম যে ভয়ানক গুরুতর! কয়টি নিরপরাধি প্রাণীর জীবন নাশের আশঙ্কা যে এতে বিদ্যমান!—এখন সে কি কত্তে পারে? সে যে বন্দী! এক পা'ও যে তা'র চল্‌বার ক্ষমতা নেই! কাজী সাহেব অনেক দিন বলেছেন, সাহাজাদার ও মতিয়ার বিয়ে হওয়াটা, নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার। তিনি বেঁচে থাকতে, এরূপ মিলন, কোন দিনই হ'তে পারবে না! এর ভিতর হয় ত কোন গূঢ়-রহস্য বিদ্যমান্ আছে, ডাকাত কর্ত্তৃক অপহৃত হবার পর হতে, মতিয়া ও হোসেনের সংবাদ তিনি কিছুই সংগ্রহ করে উঠ্‌তে পারেন নি, কত চেষ্টা করেছেন, কোন ফল হয় নি! তাঁ কে এ সমস্ত সংবাদ জানাতে পার্‌লে, হয়ত কোন প্রতিকার হতেও পারে! অতঃপর একটা দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া বলিল "দৌলত। শুধু কাঁদলে কোন ফল হ বে না বিপদে ধৈর্য্যহারা হইও না। তোমাদের রক্ষার জন্য আমি বিপদ সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলুম, কিন্তু কিছু কত্তে পারলুম না, আজ আমি বন্দী, পরিণাম ফল যে কি দাঁড়াবে তাও জানি না, আমার জীবন দিয়েও যদি হোসেনের উপকার কত্তে পাত্তুম, তবেই আমার এ উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হত! যাক্ সে কথা, আচ্ছা দৌলত! তুমি যদি একটা কাজ কত্তে পার, তবে আমি এ কারাগারে আবদ্ধ থেকেও শেষ চেষ্টা করে দেখতাম,—বল পার্‌বে?"

দৌলতন্নেছা তাহার আগ্রহান্বিত দৃষ্টি আমিনার মুখের উপর সংন্যস্ত করিয়া বলিল 'কি কত্তে হবে আমাকে আমিনা দিদি? বল, আমি চেষ্টা করে দেখব।"

আমিনা দৃঢ় স্বরে বলিল 'আমি একখানা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি একজন বিশ্বস্ত লোক দিয়ে—যদি কাজী সাহেবের নিকট পাঠিয়ে দিতে পার, তবে কোন ফল হলেও হতে পারে? বল পার্‌বে? ধরা পড়লে আর আমার রক্ষা থাক্‌বে না!"

দৌলতন্নেছা দৃঢ়তার সহিত বলিল "তা পাঠাতে পার্‌ব বলেই ত মনে হয়, আমিনা দিদি! দাও তুমি চিঠি লিখে। তবে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে বিশেষ যে কিছু হবে, এমন ত মনে হচ্ছে না!"

আমিনা আর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া, কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই চিঠি লিখার কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিল, এবং দৌলতন্নেছার হস্তে চিঠিখানা অর্পণ করিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। দৌলতন্নেছা চিঠি হস্তে দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, সঙ্কেত করিতেই, দ্বার খুলিয়া গেল। সে ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া, সে স্থান পরিত্যাগ করিল। প্রহরী পুনরায় দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। (ক্রমশঃ)

দুর্গোৎসব

(শ্রী পূর্ণিমাপ্রভা রায় সরস্বতী)

শরতের প্রভাত সূর্য্যের বিশ্ববিমোহন রক্তচ্ছটা ধরাবক্ষ চুম্বন করিয়াছে। প্রভাত সূর্য্যের কনককিরণ রেখা দিগ বধূর মুখমণ্ডল রাঙায়িত করিয়া তুলিয়াছে। দিকে দিকে শরতের অপরূপ লাবণ্য রাশি উছলিয়া-উথলিয়া-ঝরিয়া পড়িতেছে! প্রকৃতির অঙ্কে অঙ্কে শরতের সুষমা, শরতের—মধুরিমা, শরতের স্নিগ্ধ শ্যামলিমা, ফুটিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে! মাঠভরা ধান্য রাশিতে শরতের হরিত শ্যামকান্তি ফুটিয়া উঠিতেছে, শেফালিকার শুভ্রদলে, সরসীর নীলজলে, গগনের নীল শোভায় পদ্ম কুমুদের সুরভিচ্ছটায়, কি জানি কি এক অপরূপ অভিনব, অতুলনীয় রূপ মাধুর্য্য জনমন উতাল করিয়া তুলিয়াছে? কিসের এ আনন্দ? কিসের এ পুলক শিহরণ? কাহার জন্য বিশ্বপ্রকৃতির এই অপরূপ সজ্জার বিপুল আয়োজন? বুঝিয়াছি আসিয়াছে সে দিন। বাঙ্গালীর চির আকাঙ্ক্ষিত-চির-অভিপ্সীত, চির- আরাধিত সেই শুভদিন। তাই যে কাণে, কাণে আসিয়া কোন সুদূরের অলক্ষ্য চরণ নূপুর গুঞ্জন ধ্বনি মৃদু মধুর রবে বাজিতেছে? তাই যে শরতের শুভ্রোৎফুল্ল যামিনীর উচ্ছসিত সৌন্দর্য্যচ্ছটায়; অনুসন্ধিৎসু প্রাণ কোন এক মহাসৌন্দর্য্যের গভীর সন্ধানে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে। তাই যে "টুপটাপ" শিশির পতনে সন্তান বর্গের বিশুষ্ক হৃদয় মায়ের আশীষধারা বর্ষণের ন্যায় সিঞ্চিত পুলকিত হইয়া উঠিতেছে। বুঝিয়াছি আসিয়াছে সে দিন

"হাঁ চাঁদ উঠেছে বটে। বাঃ—সঙ্গে তুমিও এসেছ? এ বেশ! হাঁ ভারতের মহারাণী বটে! কেমন রাজা মনে পড়ে,—এইখানে এক শুভ্র শারদ জোছনায় তোমার চিত্তকে স্নান করিয়ে এই মহীয়সী মহিলার হৃৎপদ্মাসনে তোমায় অভিষিক্ত করেছিলাম। হাঁ, রাণী বটে—"

"কবি, আশীর্ব্বাদ করিও—যেন ভারতেশ্বরীর গৌরব ক্ষুণ্ণ না করি।"

বাবা, সাক্ষাৎ মা তুই মহাশক্তি তোর পেটে জন্মে গণেশ কার্ত্তিক—যারা জ্ঞানে শক্তিতে স্বর্গজয় করে তারকাসুর নিধন করে। এমন যাদের মা, তারা পরাধীন হতে পারে না। কখ্খনো না—

কবি, স্বপ্ন দেখছ ভুল ভেঙ্গে যাবে। জাতি যে নেই। থাক্‌ত যদি তা হলে আমার বাবা উঃ—থাক্ দীর্ঘকাল পর হয়ত আবার আমিই আস্‌ব যখন আমার বাবা নূতন হয়ে জন্মাবে—যখন বাবা মোর ঘরের দুয়ারে দুষ্‌মন নিয়ে আস্‌বে না—দুষ্‌মন তাড়াতে মেয়ের সঙ্গে প্রাণ দিবে এ যাত্রা এই শেষ—

এ কি কথা বল্লি মা—! রাজা, রাজা—

কি কবি—

শুন্‌ছ—?

না—আমি বহু দূরে গুপ্তচরের আলোক সঙ্কেতে লক্ষ্য কর্চ্ছিলাম।

(৩)

"নীরব নিশীথ নীরব ভারত
পূরিত নীরব আঁধারে।
স্তম্ভিত অতীত, ভীত ভবিষ্যত
সিকত নয়ন আসারে।
অভ্রভেদী অদ্রি উত্তুঙ্গ ভীষণ
গর্ব্ব স্ফীত বক্ষ ভীম প্রহরণ
শুনিয়া সভয়ে প্রতীচী গর্জ্জন
নিমগ্ন নীহার সাগরে।
নিস্তব্ধ নীরব যখন প্রতীচী,
লক্ষ পিককণ্ঠে কুহরিত প্রাচী,
(আজি) প্রাচীর মিহির জ্যোতিঃ প্রতীচীর
বর্ষিছে কর তীব্রধারে।
কুলিশ নির্ঘোষ বীরের হুঙ্কার
ভীম নীরবতা পরিবর্ত্তে তার
(আজি) ক্ষীণ পিককণ্ঠে অনুকারী স্বর
কম্পিত কণ্ঠে ঝঙ্কারে।
(যখন) প্রাচী সিংহাসন উন্নতি শিখরে,
প্রতীচী তখন পূরিত বর্ব্বরে,
ভীত ভিখারী আজি সেই প্রাচী
উন্নত প্রতীচী দুয়ারে।"

কবি, এ আঁধারে রণক্ষেত্রে পড়ে ডুকারিয়া কাঁদ্‌ছ?

না মা স্বপ্ন দেখছি—

স্বপ্ন—

হাঁ মা—দেখলাম শোণিত সিক্ত ভারত লক্ষ্মী সুদূর প্রতীচীর পদতলে ভিখারিণী—

তুমি কবি!

হাঁ মা, আমি কবি—ভবিষ্যৎ দেখছি—

সঙ্গে কেউ আছে?

হাঁ মা—এই লও ভারতের স্বাধীনতার পবিত্র শবদেহ। কেউ ছোঁয় নাই—সুধু সেবক হিসাবে, কবি হিসাবে—সাহিত্যিক হিসাবে—আমি ছুঁয়েছি—মা! খুব আঁধার তবু দেখ্‌ছি এ বুকের রক্তধারা গাঢ় লাল—

কাঁদ্‌ছ কেন কবি অযোগ্যের স্বাধীনতা থাকে না। জাতীয়তা হীনের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা কেন? কনোজে দিল্লীতে বিরোধেই ভারত মরে,—ভ্রাতৃ বিচ্ছেদে স্বাধীনতার চিতা জ্বলে ওঠে! দাও কবি, এ শবদেহ আমার বুকে,—এ সংযুক্তার প্রাণপতির অমর পুণ্যস্মৃতি। যদি কখনো ভাই ভাই সংযুক্ত হয়, আবার সংযুক্তা এই বীরপুরুষকে নিয়ে চিতা ভস্ম হতে বের হয়ে আসবে। আমি চল্লাম কবি, আমি এসেছিলাম ভারতে—আমি কে এতদিন বলিনি—আজ বলে যাচ্ছি—

আমি ভারতের রাজলক্ষ্মী!

হাঃ—হাঃ—নূতন বল্লি কি মা,—এ আমার জানা কথা! আমি কবি—

দাও কবি, ওই চন্দনে সাজানো চিতায় রায় পিথোরার পুণ্যময় দেহ তুলে;—আমি সেজে এসেছি—"

তুমি কোথায় যাবে মা—

একবার কোমর কাছিয়া কে না নামিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি বা নূতনত্বের জটিল পথটী সোজা মনে করিয়া একবার পা না বাড়াইয়াছে? যদিও তাহা Experiment is at always dangerous কথাটীর সত্যতাই অনেক সময়ে রক্ষা করে কিন্তু তথাপিও কোন ব্যক্তি একবার নূতনের চাট্‌নি জিহ্বায় লাগাইতে ছাড়িয়াছেন? এখন শ্যাম কি কুল যেটাই নূতন কি পুরাতন হউক না কেন দুটায় মিলাইয়া খিচুরী পাকাইবার সংবাদ ইতিহাস রাখে না। তবে তৃতীয় চতুর্থ পক্ষের যে একটা জনশ্রুতি আছে, সে অভ্যাস আমার নাই। বস্তুতঃ মধুর অভাবে গুড় বা গুড়ের বিরহে মধুর ব্যবহার চলিতে পারে এবং ইহাই চিরন্তন। তাই আমি শ্যাম এবং কুল দুটাই ঘরে রাখিতে চাই।

যাহাদের ভাঙ্গন কুলে বাড়ী তাহারা যেমন নিয়তই ঘাটে একখানা নৌকা বাধিয়া রাখে, আমরাও যৌবনের কুলে অকুল দেখিয়া বার্দ্ধক্যের ঘাটে শ্যামের ডিঙ্গা বাধিতে সাধ যায়। কিন্তু পেছন ফিরিয়া চাহিলে গত দিন গুণার জন্য যে মমতা জাগিয়া উঠে তাহারই অনুশাসনে কুল বর্জ্জন করিয়া শ্যাম রাখিতে মন চলে না।

আমার একটী প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের বার্ত্তা শুনিলে সকলেই বুঝিতে পাইবেন কেমন করিয়া নূতনের গায়ে পুরাতন এবং পুরাতনের গায়ে নূতনের অঙ্গরাগ বাধিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া যেন কোন অশীতিপর বৃদ্ধ যৌবনের দাবী করিয়া না বসেন ইহাই প্রার্থনা।

কি একটা পার্ব্বন মুখে করিয়া আমার কেরাণী খানাটা বিশ্রাম লইতে ছিল। কাজ কর্ম্ম না থাকায় এদিক ওদিক খুজিতে খুজিতে পিতামহের আমলের একটা পুরাতন সিন্দুকের দিকে চক্ষু পড়িল। দিন ভরা আলস্যে কাটাইয়া প্রত্নতত্ত্বের অছিলায় সিন্দুকের ডালা খুলিয়াই একটা অবর্ণনীয় সড় সড় শব্দ শুনিলাম। ভাবিলাম হয়ত, পিতামহের সঞ্চিত মুদ্রা শিশুর অর্থাৎ সিকি দুয়ানী জোর আধুলি ভায়ারা বেড়িয়া বেড়াইতেছে। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। অন্ধকারটী অনেকদিনের পুরাতন রোগীর মরণের গতির মত কেবলমাত্র ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাই দীর্ঘ রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায় না রহিয়া একটী কেরাছিনের ডিপ হাতে করিয়া সিন্দুকের মধ্যে মাথা ঢুকাইয়া দিলাম। আর অমনি আমার এত আশা ভরসার মুদ্রা শিশুগুলা তেলাপোকার মূর্ত্তি ধরিয়া, আমার নিজ হাতের জরিপ করা, সাড়ে তিন হাত দেহ-ভূমিতে দখল লইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তখন নিঃসন্দেহে মনে হইল, দাদা নাতিতে যে মধুর শ্যালক সম্ভাষণ বিনিময় হইয়া থাকে তাহা নিতান্ত নিরর্থক নহে।

পর দিবস প্রাতে উহাদের গঙ্গাযাত্রা করাইলাম। উহারা বৈকুণ্ঠে গেল কি শিবলোকে গেল সে সংবাদ "সৌরভ-সঙ্ঘ" লইবেন। কিন্তু, আমার পুকুরের মাছগুলা যে দীর্ঘকাল পরে একটা পুষ্টিকর খাদ্য পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিল তাহাতে সন্দেহ করা চলে না।

তিন দিবস পরে সিন্দুকটী খুলিয়া পাইলাম ১২১৩ সনের একখানা নূতন পঞ্জিকা! বিধাতার কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি, গুপ্তপ্রেসের কি অদ্ভুত মহিমা, এতগুলা দিন যাহার গায়ের উপর দিয়া গড়াইয়া গেল আজও তাহার নূতনের খেতাবটী পুরাতন হইল না। সেইদিনই বুঝিলাম যাহা কিছু বাঁচিয়া থাকিলেই নূতন থাকে। কেহ বা বিবর্ত্তবাদের নিত্যনূতন টানা হেচ্‌ড়ায়, আর কেহবা নিত্য নূতন সুখ দুঃখের নৈমিত্তিকতায়।

আমার এক অতি বৃদ্ধ প্রতিবেশিনী ছিলেন, তিনি তাহার অশীতি বৎসর বয়সের শিশু পুত্রটীকে খোকা বলিয়া ডাকিতেন। আমিও সেই দন্তহীন খোকাটীর খোকাত্বের অনুপাতেই পঞ্জিকার নূতনত্বের বয়সটী মাপিয়া লইলাম। এবং মনে মনে বলিলাম হে গুপ্তপ্রেসের সত্বাধিকারিগণ তোমরা যদি দেশটা ভরিয়া কপালে কপালে ঐ তিনটী অক্ষয় ছাপিয়া দিতে পারিতে, তবে অতি তুচ্ছ পাকা চুল বা দন্তহীনতার নজির ধরিয়া বৃদ্ধ বয়সে ব্যক্তি বিশেষের চক্ষুশূল হইতে হইত না।

অনেক বাজে বকিয়া ফেলিলাম। যাহা হউক পঞ্জিকা হাতে তুলিয়া বুঝিলাম তেলাপোকার দেশে পাঁচ আইনের বালাই নাই। উহাদের মূত্রত্যাগের অভ্যাস আছে কি না আয়ুর্ব্বেদ সে সম্পর্কে নীরব, কিন্তু মল ত্যাগ প্রচেষ্টায় খুঁৎ খাঁৎ ভরাট করিয়া, উহাকে যে পুরাতন হইতে দেয় নাই, আমি নিজেই তাহার চূড়ান্ত সাক্ষী। সেই দিনই বুঝিলাম যাহাদের

না, নূতন তাম্বূলের ঝাল এবং নূতন মামলায় বারবরদারী অধিক, নূতন রোগে লক্ষণের বিড়ম্বনা বেশী, প্রথম সিন্দুর রূপসীর কপাল ঢাকিয়া ফেলে, নূতন মাঝীর আতঙ্ক থাকে, নূতন হাট সহজে জমে না, নূতন লেখকের কালি কলমের খরচ বেশী, নূতন বক্তার নিন্দার ভয় প্রচুর।

নূতন বধূর ঘোমটার আড়গোড় ভাঙ্গিতে যাইয়া অনেক রসিকেরই বিরহ জাগিয়া উঠে। কিন্তু নূতন বধূ যখন গিন্নির তক্তে বসিয়া সহজ সরল অথচ তীব্র লজ্জা শূন্য অবস্থায় হাসির ছটায় গরীবের ঘরের কেরাছিনের চিরাগটীকে বৈদ্যুতিকে ফলাইয়া তোলে; তৃতীয় ধোপের লাল পেড়ে শাড়ীখানা পড়িয়া পিয়াস্থ চক্ষু দুটীকে শত পাকে ঘুড়াইয়া, কথার ছলায় তোমার মনের গায়ে সোণালী রং ঢালিয়া দেয়, বলি তখনো কি তোমার নূতনের বালাই লইয়া বুক জুড়াইতে ইচ্ছা করে? নূতন বিনামার ক্ষতটা যখন ছয় মাস ধরিয়া খোড়া করিয়া রাখে, নূতন ধনী যখন চাঁদার উপরে চাঁদা, টেক্সের উপরে টেক্স দিয়া হয়রান হইয়া পড়ে, নূতন দরিদ্র যখন শত চেষ্টা করিয়াও পুরাতন হালচাল বদলাইতে না পারিয়া চক্ষুলজ্জার তীব্র দংশনে মরমে মরিতে থাকে; তখন কতখানি দুঃখ লইয়া পুরাতনের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে?

নূতন তেতুল রসনায় মাঘের শীত আনিয়া দেয়, নবান্নের পায়স উদরে বিষ্ণু জন্মায়, পুণ্যাহের আনন্দ প্রজার মহাশ্বাস ডাকিয়া আনে, নূতন তণ্ডুলে অন্নে হাড়ি ভরে না, নূতন ধনীর মেজাজ অসহনীয়, নূতন পুঞ্জ দর্শনেও দর্শনী লাগে। কিন্তু বিপত্নিকও পুরাতনের দোহাই দিয়া শশুর গৃহে আদর পায়। নূতন বন্ধুত্বে বিস্মৃতির আশঙ্কা বেশী, নূতন জলে সর্দ্দি আসে, নূতন কুটুম্বিতায় তত্ত্বের হেঙ্গামা বেশী, নূতন পূজকের আড়ম্বর থাকে, নূতন প্রদীপের তৈল খরচ অধিক, টাট্‌কা ভাতে জিহ্বা পুড়িয়া যায়। বস্তুতঃ পুরাতনে গুণাধিক্য বেশী না থাকিলে সর্ব্বত্যাগী মহেশ্বর সতী দেহ ঘাঁটে করিয়া সৃষ্টি জোরা ছুটিয়া মরিতেন না। তাই আমি নিয়তই ভাবি, এখন "শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।" যখনই যাহা চক্ষের কাছে দেখি তখনইত তাহা মিঠা লাগে এবং তাহারই রস বৈশিষ্ট্যে মন ডুবাইয়া রাখিতে চিত্ত এলাইয়া পড়ে।

আমাদের বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন বাহিরের ছড়ান প্রাণ কুড়াইয়া ভাড় করিতে পরিলে, দেখিবে সেই মরণশীল নূতন রূপ, নূতন সুখের আশায় নাচাইবে না, লালসার দাসত্বে নিজত্বের দাবীটুকু বিক্রয় করিয়া জন্ম মরণ গতির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বিশ্ব প্রকৃতির লাথি খাইতে হইবে না। তখন বিশ্বময় সেই বিশ্বেশ্বরের চিরস্থির মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারই ধ্যানে, তাহারই জ্ঞানে অনন্তকালের জন্য ডুবিয়া যাইবে। তখন নূতন পুরাতনের বিচার বুদ্ধি আপনিই সংযত হইবে এবং রূপ তোমাকে আকর্ষণ করিতে, রস তোমাকে অলস করিতে, গন্ধ তোমাকে চঞ্চল করিতে এবং স্পর্শ তোমাকে এক তিল হটাইতে পারিবে না।

হরি! হরি! পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিয়া যে পাগল হইতে ইচ্ছা হয় বস্তুতঃ পাগলা গারদের চাবিটী দুদণ্ডের জন্য পাইলে বুঝাইয়া দিতাম কোন্‌টা নূতন আর কোন্‌টা পুরাতন।

রাধা *

[অধ্যাপক শ্রীসুধেন্দুকুমার বাক্‌চী এম, এ]

চৈত্রের শেষ সন্ধ্যা ম্লান হ'য়ে এল—বৈষ্ণব ভিখারী একতারা নিয়ে গাইছিল,—

"যাওল চেত মদনসখা কুণ্ঠিত
লহু লহু চাহ পিছুপানে,
সাঁওল সাঁঝ কদম মূল শিহরিত
ঘন ঘন বাঁশরী তানে।
মুরলী! একই বোলি তুঝ সাধা,
দোসর গীত নাহি কি তুয়া অন্তর,
বোলত বোলত রাধা?"—

এইটুকু শুন্‌তে পেলাম, তারপর আর শোনা হ'ল না। আমার ক্লান্ত বৎসরটিও একটি অসমাপ্ত কীর্ত্তনের মত চৈত্রের শেষ অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গেল—কিন্তু রেখে গেল একটি কাকুতিভরা জিজ্ঞাসার ধূয়া—

—"দোসর গীত নাহি কি তুয়া অন্তর
বোলত বোলত রাধা?"

এর উত্তর পাই কোথা? "বোলত বোলত রাধা?"—বেদ নীরব,—পঞ্চধারার কলধ্বনির মধ্যে বৈদিক ঋষি

* সুসঙ্গ সাহিত্য সভায় পঠিত।

রাধার সন্ধান পান নাই। উপনিষদের মুখ ঘন শ্রাবণের সান্ধ্যগাম্ভীর্য্যের মত রহস্যময়,—দৃষ্টি অচিন্ত্যের উদ্দেশ্যে বাদল মেঘের অতল স্পর্শতায় হারিয়ে গিয়েছে। পুরাণকারের মধ্যে যেন "ধরি-ধরি-ধরা-হল-না" ভাব। পেয়েছেন,—কিন্তু এই বৈষ্ণব ভিখারীর মত এমন সত্যরূপে, এমন নিবিড় ভাবে পান নি; শুনেছেন,—যেন কি গানের মত, যেন কোথা থেকে আস্‌ছে,—কিন্তু এমন করে তাঁর প্রাণে বেজে ওঠে নি "বোলত বোলত রাধা"। ধর্ম্মশাস্ত্র যখন মূক, অনন্ত মুহূর্ত্তে কবি তখন মুখর হয়ে উঠলেন—

"অপরূপ পেখনু রামা
কনকলতা অবলম্বনে উথল
হরিণহীন হিমধামা।"

(৩)

কিন্তু 'পেখনু' কোথায়? কে সেই "অপরূপ রামা?" দ্যুলোকের অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে তাঁর কোনও গ্রন্থি আছে বলে কেউ জানে না। দেববালাদের তারা বীথিকার পরিপূর্ণ অবসরের অন্তরাল হতে কখনও তাঁকে কেউ মিটি মিটি চাইতে দেখে নাই। পারিজাত উৎসবের দিনে পরাগমদির সন্ধ্যায় বিদ্যুল্লেখাগণের সঙ্গে নন্দনের কানন পথে তিনি কখনও চরণরেখাপাত করেন নাই। বৈকুণ্ঠের কুণ্ঠাহীন দ্যুতির মধ্যে অম্লান আনন্দের ভিতর কখনও তাঁর নূপুর শিঞ্জিনি ধ্বনিত হয় নাই। তবুও ফাল্গুনী পূর্ণিমার কুঙ্কুম কেলির কলতানে, ঝুলন রজনীর দোলন-ছন্দমুখর মেঘমেদুর আকাশের মধ্যে, রাসলীলার লীলায়িত আনন্দ গুঞ্জনে, বহুযুগ ধরে কোন্ গুপ্ত বৃন্দাবনের ভিখারী বৈষ্ণবের সুর কালিন্দীকল্লোলের সাথে মিলিত হয়ে বাজ্‌ছে—"অপরূপ পেখনু রামা।"

(৪)

না,—প্রাচীন শাস্ত্রকারকে একেবারে রাধাহীন ভাবা ভুল। তিনি স্পষ্ট করে রাধাকে পান নি,—কিন্তু তাঁর অস্পষ্ট অনুভূতিতে, পুলক শিহরণে, নিবিড় ভূমানন্দে, প্রাণগহনচারিণী রাধিকারই স্পর্শলাভ করেছেন। চিরন্তনী রাধা অমূর্ত্ত আহ্লাদের আকারে যুগযুগান্ত হতে শাস্ত্রকারের অঙ্গে অঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছেন। তাই উপনিষদ্‌কারের ব্রীড়াবতী পুরবালা আনন্দবাসরের মধ্যে আনন্দরূপের সঙ্গে স্বয়ম্বরা হয়েছেন। তাই উপনিষদের শ্যামল ঘনছায়াতলে এত ইঙ্গিত, এত অস্পষ্টতা, এত কানাকানি, এত চকিত-গোপন-প্রকাশের সচল লীলা।

(৫)

শাস্ত্রকারের আনন্দবেদনবাসিনী অদেহী রাধা বৈষ্ণব কবির প্রেরণায় প্রাণস্পর্শে মূর্ত্ত হয়ে উঠ্‌লেন—গোধূলি সন্ধ্যার অভিসারিকা—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ স্পর্শের পরিপূর্ণ সুষমা, উতলা, কুণ্ঠিতা, আবেগময়ী, কৃষ্ণমুখী, পুরুষপ্রধানের অভিযানযাত্রী; আর কবি এই অভিসার চঞ্চলা বিশ্বপ্রকৃতির ঝিল্লীনূপুরধ্বনির সুরে সুর মিলিত করে গাইলেন—

"যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নব হলধর বিজুলি রেহা
দ্বন্দ্ব পশারি গেলি।"

(৬)

বৈষ্ণব কবির আনন্দ দুলালী রাধা বিশ্বপ্রাণের আবেগ-ময়ী গীতি কবিতা। গ্রহতারকার প্রতীক্ষাভরা নির্নিমেষ দৃষ্টিতে, সিন্ধুর নীলচঞ্চল উচ্ছ্বসিত অনুসন্ধানে, তমালবনের রহস্যময় আহ্বানস্বননে, নরনারীপ্রাণের দুর্ব্বোধ অনির্দ্দিষ্ট, আকাঙ্ক্ষা-স্পন্দনে বৈষ্ণব কবি বিশ্বপ্রকৃতির গোপনবাণী শুনলেন—

"একলি যাওব তুঝ অভিসারে
তুহুঁ মম প্রিয়তম কি ফল বিচারে?"

—শুন্‌লেন, আর স্বেদপুলক কম্পনের মধ্যে অনুভব করলেন যে তাঁর জীবনগুহাবাসিনী রাধা বিশ্বপ্রকৃতির পরিপূর্ণ প্রাণে, পরিপূর্ণ শোভাতে শ্রীমতী। নিজের মধ্যে যে মুহূর্ত্তে বিশ্বপ্রকৃতিকে বৈষ্ণব কবি উপলব্ধি করলেন, অমনি পরমপুরুষের নীরব ইঙ্গিত রবময়ী, মুরলীধ্বনির আকারে তাঁর অন্তর-বৃন্দাবনে বেজে উঠ্‌ল,—অশ্রু যমুনায় উজান বইল,—বেলা শেষের সুর রাজপুরীর বাতায়নে আকুল মিনতি নিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল আর কবি প্রাণের চিরন্তনী বৃকভানুনন্দিনী অজানা রাখালিয়া বঁধুর উদ্দেশে ছুট্‌ল—

"একলি যাওব তুঝ অভিসারে
তুহুঁ মম প্রিয়তম কি ফল বিচারে?"

একটী বাণীতে সংসার জীবনে আর্টের মূল্য দেখান হইয়াছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন।

জোটে যদি মোটে একটী পয়সা
থাস্ত কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি,
দুটী যদি জোটে তবে অর্দ্ধেকে তার
ফুল কিনে নিয়ো হে অনুরাগি!
বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল
সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল
দুনিয়ার মাঝে সেইত সুধা।"

মানব জীবনের বাহ্যিক অভাব অনটন ও প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে বিচার করিলে কাব্য শিল্প ও সৌন্দর্য্যের বিশেষ মূল্যই আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু অন্তরের অন্তঃ-প্রেরণার দিক হইতে বিচার করিলে ইহার চরম সার্থকতার কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। 'Addision বলিয়াছেন There is nothing that makes its way more directly to the soul than beauty" একটা সুন্দর জিনিষের পক্ষে ইহাই হইল পরম লাভ। অন্ধকারের ভিতর সঞ্চারিণী দীপশিখার মত দুঃখ বিষাদময় সংসারভূমে সে যদিবা একটু পবিত্র আনন্দ বিতরণে সমর্থ হইল—ইহাই তার সার্থক পরিণতি।

সৌন্দর্য্যের সার্থকতা ও প্রয়োজন সম্বন্ধে এইমাত্র যে কথা বলা হইল কাব্যের সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। কারণ সুন্দরের উপাসনা ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতেই কাব্যের প্রধান প্রয়াস। কবি আপনার সূক্ষ্ম ও উপাদেয় বিশ্লেষণে সৌন্দর্য্যের অনন্ত খনি আবিষ্কার করেন আর তাহা নিত্যকালের জন্য বিশ্ববাসীর উপভোগের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের ডালি বহন করাই কাব্যের একমাত্র বস্তু নয়। কবি Coleridge বলেন "Poetry is the blossom and fragrance of all human knowledge which immediately diffuses a secret satisfaction and comapliances through the imagination human thought, human passion emotions and language" মানব জীবনের সমস্ত সঞ্চিত জ্ঞান সম্পদ চিন্তাধারা ও বাসনা কামনাতেই. ইহার সত্যি-কার প্রসার দেখা যায়। সংসারের অভিজ্ঞতা-সম্ভার ইহার বুকে পাদচিহ্ন আঁকিয়া অগ্রসর হইয়া থাকে। মানব জীবনের প্রবাহমান সাধনা ধারণার ইহাই মাপকাঠি। এককথায় কমবেশী পরিমাণে কাব্য জীবনের মূর্ত্ত ছবি Mathew Arnold এর লেখাও একথাটার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে Poetry is the criticism of lifs'—জীবনের সমালোচনাই কাব্য। বিশ্বজীবনের স্বরূপ অঙ্কন কাব্যের বিষয়ীভূত। আর ঠিক এই সম্পদ আছে বলিয়াই কাব্য মানুষকে তার নিজের সাথে পরিচিত করিয়া দেয়; ইহার ভিতর দিয়া সে আত্মচেতনার সুযোগ লাভ করে ও সত্যাদর্শের বিমল জ্যোতিতে আপন জীবনের পরিমাপ করিয়া মানুষ নব প্রেরণা লাভ করে।

বস্তুতঃ জীবনের নিপুণ বিশ্লেষণেই কাব্যের প্রধান সার্থকতা, কারণ শ্রেষ্ঠ কাব্য সর্ব্বদাই জীবন রহস্য লইয়া। অব্যক্তকে ব্যক্ত করিবার একটা সাধনা ইহার ভিতর বর্ত্তমান। অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে সত্যকে প্রকাশ করিবার, অজানাকে জানার ভিতর টানিয়া আনার ও বিরাটকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিবার যে পরম তৃষা মানুষের গুমরিত অন্তঃস্থলে স্পন্দন জাগাইয়া থাকে একমাত্র কবির কাব্যচর্চ্চাই জগতের সম্মুখে সে অচিন্‌পথের স্বরূপ নির্দ্দেশ করে।

Prof Mackail বলিয়াছেন Poetry is that artistic and dignified expression of emotional thought which in its operation creates patterns of life; thought and speech. মানব জীবনের ভাবাবেগ সমূহের উদার বিশ্লেষণে, নিজ দীপ্ত মনীষা ও কল্পনা প্রভাবে কবি মানুষের জীবন ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে এমন সব আদর্শ সৃষ্টি করেন যাহা দশের দ্বারা অনুসৃত হইয়া সমাজের বুকে উৎকর্ষতা আনয়ন করে। ফলে চারিদিকের আঁধার গ্লানিমার ভিতর আলোক রেখা ফুটীয়া উঠে। বাস্তবিক সারা বিশ্বের জন্য একটা সমুন্নত মঙ্গল প্রচেষ্টা অনেক সময়ই কাব্যের প্রাণ স্বরূপ—

"অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দ লোক করি বিরচন

মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

কল্যাণে তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতে পারে তাহাই তাহার মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য হইতেই তাহার আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ হইতেই যাবতীয় কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত হয়। সামাজিক জীবনের মূল তত্ত্বই কিভাবে সমাজস্থ সমস্ত মনুষ্য ব্যক্তিগতভাবে উন্নত হইয়া সমাজের এবং সম্ভব হইলে বিশ্বমানবের চরম কল্যাণ সাধন করিতে পারে, এই চরম কল্যাণের মূলেই মানবের আত্মনিয়ন্ত্রণ। এই আত্মনিয়ন্ত্রণ শক্তি আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মধ্যদিয়া, আমাদের অশন, বসন, আহার, বিহার প্রভৃতির ভিতর দিয়া এবং আমাদের কর্ম্মময় জীবনের যাবতীয় কর্ম্মের ভিতর দিয়া পরিচালিত করিয়া আমাদের মনুষ্যত্বের ক্রমোদ্বোধন করিতে হইবে। কাজেই সামাজিক জীবনের মূলস্থিতি আমাদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ মূলক কর্ম্মময় জীবনের কর্ম্মশক্তির সুষ্ঠ পরিচালনার উপর নির্ভর করে। এবং এই পরিচালনাদ্বারাই আমাদের দেখিতে হইবে সমাজের বিভিন্নস্তরের অবস্থা বৈষম্য যথাসম্ভব দূর করিয়া কিভাবে আমরা সমাজ স্থিতির সহায়ক হইতে পারি অর্থাৎ আমাদের দেখিতে হইবে আমরা কি ভাবে আমাদের দৈনন্দিন কর্ম্মপ্রবাহ নিয়মিত করিব যাহাতে সমাজস্থিতির উপরি উক্ত মূলভিত্তি আমাদের জীবনের পরিচালনাদ্বারা আমরা সুদৃঢ় করিতে পারি এবং মানবের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের তথা নিজের আত্মোন্নতির চরম উদ্দেশ্য সফলকাম হইতে পারি। যে সমাজ যত পরিমাণে এই উদ্দেশ্য নিয়া সামাজিক জীবন পরিচালিত করে সেই সমাজ সেই পরিমাণ উন্নত এবং যে ব্যক্তি যে পরিমাণে এই উদ্দেশ্য নিয়া জীবন পরিচালিত করেন তিনি তত পরিমাণ উন্নত এবং মানবের উন্নতির সহায়ক এবং তাহার সমাজাত্মবোধ (Social conscience) তত পরিমাণ উন্নত।

এখন দেখিতে হইবে কি অবস্থায় আমরা সমাজের উন্নত অবস্থা বুঝিব। এক কথায় বলিতে গেলে যে সমাজে সমাজের সমস্ত লোক মানবের উপভোগ্য এবং আবশ্যকীয় যাবতীয় সুখ সুবিধা সর্ব্বাধিক পরিমাণে ভোগ করিতে পারে অর্থাৎ নিজ ব্যবহারে আনিয়া মানবতার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে সেই সমাজ উন্নত। "Manimum satisfaction of the Manimum numbers" ইহাই সমাজ জীবনের অর্থনৈতিক আদর্শ, অবশ্য এই satisfaction এর মধ্যে যাহা মানবতার বিরোধী এবং মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। এখন কিভাবে এই Manimum satisfaction আমরা সমাজ জীবনে উপলব্ধি করিতে পারি তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের মানব জীবনে যতপ্রকার প্রয়োজন তাহা প্রধানতঃ তিন প্রকার—

১। যে সমস্ত প্রয়োজন আমাদের জীবনধারণের জন্য আবশ্যক অর্থাৎ যাহা না হইলে আমরা কিছুতেই বাঁচিতে পারি না।

২। যে সমস্ত প্রয়োজন আমাদের মনুষ্যত্ব বাড়াইবার জন্য আবশ্যক।

৩। যে সমস্ত প্রয়োজন আমাদের জীবনধারণের পক্ষে কিংবা আমাদের মনুষ্যত্ব বাড়াইবার জন্য আবশ্যকীয় নহে অর্থাৎ যে সমস্ত আমাদের না হইলেও হয়। সমাজ জীবনে যাহাতে সকলেই উপরিউক্ত তিন প্রকার সুখ সুবিধা সর্ব্বাধিক পরিমাণে ভোগ করিতে পারে এবং তন্মূলে মানব জীবনের যাবতীয় অন্তর্নিহিত শক্তিগুলিকে উন্মেষ করিয়া মনুষ্যত্বের চরম উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে তাহাতেই সমাজের চরম কল্যাণ এবং তাহাতেই Manimum satisfaction এর দিকে অনেকটা অগ্রসর হওয়া যায়। শেষোক্ত তৃতীয় প্রকারের অভাবগুলি অপেক্ষা ১ম ও দ্বিতীয় প্রকারের অভাবগুলি অন্ততঃ সমাজের সর্ব্বস্তরের লোকই ভোগ করিতে পারে, তাহাই সমাজ জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত, কারণ ১ম ও ২য় প্রকারের অভাবগুলি বর্ত্তমান সভ্য মানবজীবনের উন্নতির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। প্রথম প্রকারে অভাব না হইলে আমরা বাঁচিতে পারি না—আহার, পরিধেয়বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি আমাদের বাঁচিবার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রকারের অভাবের মধ্যে—শিক্ষা, দীক্ষা; নৈতিক উন্নতির জন্য জীবনকে প্রস্তুত করা ইত্যাদি ও বর্ত্তমান সভ্য মানবসমাজের সভ্য মানবরূপে জীবনকে উন্নত করিবার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। শেষোক্ত অভাবগুলি যাহা অর্থনীতির ভাষায় luxury বলা হয় তাহা আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় না হইলেও হয়—সেগুলি অনেকে তাহাদের জীবন পরিচালনা

জীবন্তি"—। ঠিক কথা, আনন্দই যে জীবন; যাহার আনন্দ নাই, সে আবার জীবিত কি? সে শুধু শ্বাস ফেলে, কিন্তু বাঁচিয়া নাই। কেবলই মনে হইল, দাও প্রভু, ঐ আনন্দের এক কণা, আর যে কিছুই চাইনা, কিছুই চাই না প্রভু। এ আনন্দ যে পায়, তাহার কাছে বাতাস, আকাশ—এমননিকি "পার্থিবং রজঃ" ও যে মধুবৎ হইয়া উঠে। কেমন করিয়া সে মধুর সন্ধান করিতে হয়, কে বলিয়া দিবে?

প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পরেই মনে হইল আহারের কথা। রাত্রিতে কিছু খাওয়া হয় নাই; গৃহে থাকিলে হয়ত আমার মত Dyspeptic এর এই ভোরের বেলাতেই খরচার কথা মনে হইত না। কিন্তু আজ জল-বাতাস ও সুনিদ্রায় বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। পণ্ডিতেরা বলেন—ক্ষুধাটা জীব ধর্ম্ম; আজ বুঝিলাম আমিও একটা জীব বটে, যেহেতু আমারও ক্ষুধা হইয়াছে। এ জীবধর্ম্মটা প্রায় হারাইয়া যাইবার মত হওয়াতেই দেহটা হারাইবার দশায় আসিয়াছি। কাজেই ক্ষুধায় একটু আনন্দ দিল। ততক্ষণ শ্রীমান্ অখিলচন্দ্রও উঠিয়াছিলেন। তাঁহাকে আহারের কথা বলিলাম। বাবাজী কিন্তু ভাবনায় পড়িলেন। বুঝিলাম, এ ভাবনা, পাকের জন্য। আহার করিতে হইলেই পাক করা ছাড়া, উপায় নাই। কিন্তু সে বিদ্যায় পুত্র, পিতার মতই সুদক্ষ। কাজেই পোড়াবাড়ী যাইয়া হোটেলের রাঁধা ভাত অথবা লুচী মিঠাই খাওয়ার দিকেই বাবাজীর আগ্রহ দেখা গেল। কিন্তু নৌকার গতি বড় মৃদু, বুঝা গেল পোড়াবাড়ী যাইতে মধ্যাহ্ন আগত হইয়া যাইবে। কাজেই অগত্যা পাকেরই উদ্যোগ করিতে হইল। মাঝি, চুলা ধরাইয়া দিল, অখিলচন্দ্র ডাইল তুলিয়া দিলেন। আমি বসিয়া বসিয়া অখিলের নিষেধ সত্ত্বেও হোমের পুরোহিতের মত ২।১ খানা সমিধ্ নহে—শুষ্ক ইন্ধন চুলায় প্রক্ষেপ করিতে লাগিলাম। ডাইল ভাত রাঁধাও যজ্ঞই বটে, আর যজ্ঞ কেন, ইহাই বোধ হয় বড় যজ্ঞ। ঋষিদের ভাষায় পাক-যজ্ঞ। এই যজ্ঞের ফলেই ত মানুষ বাঁচিয়া আছে। 'স্বাহা' শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে কোনমতে মসুরের ডাইল আর ভাত হইয়া গেল। স্নান করিয়া আহার করিলাম। তৃপ্তিতেই বটে, কেন না সকল উপকরণের শ্রেষ্ঠ, ক্ষুধা নামক উপকরণটি প্রচুরই ছিল। কাজেই কোন অসুবিধা হইল না। নদীর ঘোলা জল, পরম তৃপ্তিতেই আকণ্ঠ ভরিয়া পান করিলাম। আজ আর ঘোলা বলিয়া দ্বিধা নাই। ক্ষুধা-তৃষ্ণার এমনই তাড়না।

পোড়াবাড়ী আসিলাম। আমরা যে ষ্টীমারে যাইব—যাহাকে কালীগঞ্জ ষ্টীমার বলে—তাহা তখনও আসে নাই। কখন আসিবে তাহারও ঠিকানা কেহ বলিতে পারিল না। ধূম দেখিয়া নাকি উহার আগমন বুঝিয়া লইতে হয়। ন্যায়শাস্ত্রের বাঙ্গালিগণ ধূম দেখিয়া আগুনের অনুমানের একটা শিক্ষা, অনেকদিন হইতে আছে। ধূম দেখিয়া ষ্টীমার আসিবার অনুমান ইংরাজ আমলের শিক্ষা। আমরা সেই ধূম দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে "স্থলচর" নামক ষ্টেশনটির দিকে জলচর ষ্টীমারের জন্য চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম আর নৌকায় বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলাম। এইভাবে বিকালটা গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ষ্টীমার আসিল। তাড়াতাড়ি সুটকেস ও বিছানা কুলীর মাথায় চাপাইয়া দিয়া ষ্টীমারে উঠিয়া পড়িলাম। সস্তায় পার হইবার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া ছিলাম। তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া একবার চক্ষু স্থির হইল—একবারে "ন স্থানং তিলধারণে", যাত্রীতে জাহাজ বোঝাই। টিকিট বদলাইবার একবার ইচ্ছা হইল কিন্তু তখনই মনে হইল, কেন ইহারাও ত আমরাই—আমারই ভাই সব। ইহাদের সঙ্গে থাকিতে পারিব না কেন? যদি ইহাদের সঙ্গে, অবহেলা বা ঘৃণা করি, বাঙ্গলা মাকেই ঘৃণা করা হইবে। সে পাপ করিব না, তৃতীয় শ্রেণীতেই যাইব। কোনমতে একটু স্থান করিয়া বসিয়া পড়িলাম।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর পেটার্ণ ষোলআনাই কৃষক শ্রেণীর মুসলমান, হিন্দু অল্প। ইহারা, সপরিবার কেহবা একা, "খোলাবান্ধা" চলিয়াছে। বাঙ্গলা-মা এই ছেলে-গুলিকে ছাড়িয়া দিয়াছেন—হয়ত খেদাইয়াই দিয়াছেন। ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া ইহারা আসামের বন জঙ্গলে অন্নের সন্ধানে আশ্রয় লইতে চলিয়াছে।

আমার এই গৃহ-ছাড়া ভাইদের মধ্যে বসিয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলাম। আলাপে জানিলাম—

দেশে থাকিলে দিন-মজুরী ছাড়া পুরুষানুক্রমে যাহাদের অন্য কোন গতির সম্ভাবনা ছিল না. "খোলাবান্ধা" গিয়া তাহারাও দু-দশ বিঘা জমি করিয়াছে। উদরের জ্বালা নিবারণ করিতে পারিয়াছে বলিয়াই উহারা সেই স্বজন-হীন স্থানেও একটা তৃপ্তি বোধ করিতেছে। অনেকে আসামের জল-বায়ু সহিতে না পারিয়া মরিতেছে ও বটে, কিন্তু সে মরণের জন্য ইহারা কেহই ভীত নহে। মরণ জয় করিতে অথবা মরিতে ইহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। একজন মরিলে সেখানে বাঙ্গলা হইতে দশজন যাইয়া দাঁড়াইতেছে। বাঙ্গলা মায়ের সংশপ্তক সন্তানগণ, আসাম জয় করিয়া আসামকে বাঙ্গলা করিয়া তুলিল, সে বিষয় আর সন্দেহ নাই। আসামে বাঙ্গলার এই বিজয়-গৌরব, এই গৃহ-হারা লক্ষ্মী-ছড়া কৃষকদিগেরই বটে। শিক্ষিত বলিয়া যাহারা অভিমানী, সেই হস্তপদ-হীন কেতাবের বোঝা বাহকদিগের নহে।

রাত্রি ১২টার পর ষ্টীমার জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে ভিড়িল। আমরা ষ্টীমার হইতে নামিয়া তল্‌পী সহ রেলগাড়ীতে যাইয়া বসিলাম। ত্রিশানে বন্দী রহিলাম, ভোর ৫টা পর্য্যন্ত। জগন্নাথগঞ্জে চোর ও গাট-কাটার উপদ্রব বড় বেশী। আধঘণ্টা পরে পরেই একজন কনেষ্টবল আসিয়া যাত্রীদিগকে সতর্ক করিয়া যাইতে লাগিল। ব্যবহারটি সুন্দর। গাড়ীর মধ্যেও সতর্কতার জন্য বিজ্ঞাপন আটা দেখিলাম।

ভোরে গাড়ী ছাড়িল। সিংজানী ষ্টেশনে (জামালপুর) সাড়ে ছয়টার সময় পঁহুছিয়া আমরা নামিয়া পড়িলাম। এখান হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে জামালপুর সহরের মধ্য দিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মপুত্রের খেয়াঘাটে যাইতে হইবে। একখানা গাড়ী করিয়া যাত্রা করিলাম। খেয়াঘাটে যখন পঁহুছিলাম তখন ৭টা বাজিয়া গিয়াছে! ব্রহ্মপুত্র পার হইবার জন্য একখানা ষ্টীম-লঞ্চ আছে শুনিলাম কিন্তু দেখিলাম না। সেখানা নাকি ওপার গিয়াছে, কখন আসিবে ঠিক নাই। কাজেই ধ্রুব খেয়ানৌকা পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুব লঞ্চের জন্য অপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না। আমরা খেয়া নৌকায় উঠিয়া পড়িলাম। নৌকাখানা খুবই বড়। মাঝি ৩জন; সবই পশ্চিমা, বাঙ্গালী নয়। শ্রমের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীকে পশ্চিমারা সব জায়গাতেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। ষ্টেশনে ষ্টেশনে যত কুলী, সবই পশ্চিমা, বিড়ি সিগারেট-পান-মিঠাই বিক্রেতা পশ্চিমা, খেয়া নৌকাতেও পশ্চিমা। বাঙ্গালার শ্রমজীবীরা হয় 'বাবু' হইয়াছে, নয় দেশ ছাড়িয়া আসাম চলিয়াছে, বাঙ্গালায় তাহাদের ভাত নাই। তাহাদের ভাত পশ্চিমারা কাড়িয়া নিয়াছে। স্বদেশে যাহাদের এমন পরাজয়, তাহারাই কিন্তু চলিয়াছে, আসাম বিজয়ে।

পশ্চিমা বাহক তিনজন, যেরূপ নৌকাখানি বাহিতে লাগিল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল, যে দেশে উহাদের বাড়ী, তাহার আশে-পাশে নদী নাই, এবং উহাদের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের কেহই নৌকা বাহে নাই। চটের একটা প্রকাণ্ড পাল, উহারা তুলিয়া দিল, কিন্তু উহা নৌকা চালাইবার জন্য, কি আরোহীদিগের গায়ে ধাক্কা দিবার জন্য, সেটা ভাল করিয়া বুঝা গেল না। বাতাস নাই কাজেই পাল রূপী সেই প্রকাণ্ড চট, ঘুরিয়া ফিরিয়া যাত্রীদের গায়ে মাথায় কেবল ধূলাই মাখিতে লাগিল, নৌকা চলিবার তাহাতে কোন সহায়তা হইল না। অগত্যা নাবিক তিনজন দাঁড় ধরিল। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের বলের কাছে, এই গঙ্গাপুত্রদের হাতের বল হারিতে লাগিল। বহুশ্রমে পূর্ণ দুই ঘণ্টায় ইহারা নৌকাখানা, নির্দ্দিষ্ট ঘাটের অনেক দূর ভাটীতে গিয়া ভিড়াইল। যেখানে নৌকা ভিড়াইল উহার নাম 'পক্ষী-মারী'। রৌ-মারী, চিল-মারীর সোদর ভাই। আমরা 'দুর্গা' বলিয়া পক্ষীমারীতে নামিয়া পড়িলাম।

পক্ষীমারির বটগাছ তলায় সেরপুর যাইবার মোটর ও ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়ায়। আমরা সেখানে যাইয়া দেখিলাম সবগুলি মোটরই চলিয়া গিয়াছে। অগত্যা একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতেই উঠিয়া বসিলাম। কিন্তু বিপদ কাটিল না, গাড়ীখানার দুইটি ঘোড়ার মধ্যে একটি একবারে অশিক্ষিত। গাড়োয়ানের ইঙ্গিত ত বুঝেই না, চাবুকও মানে না। গাড়ীখানাকে বিপথে নিয়া ফেলিতে অশ্বিণী-নন্দনের যে আগ্রহ, তাহার এক ভগ্নাংশও সোজা পথে চলিতে নয়। কাজেই গাড়োয়ান বার বার নামিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া যাইতে লাগিল। সুতরাং নামে ইহা ঘোড়ার গাড়ী হইলেও কাজের বেলায় ঘোড়া-মানুষের গাড়ী। এই অপূর্ব্ব গাড়ীতে প্রাণটা হাতে করিয়া কোনমতে সেরপুরে আসিয়া পঁহুছিলাম। বোধ হয় রাস্তাটি প্রশস্ত আর পাকা বলিয়াই এ গাড়ীতে আসা।

অবিচারের মাত্রাটা, অনেকটা হালকা কত্তে চাইছি। রাত্রি সাতটায় বিবাহ কার্য্য শেষ করে,—তবে কাজি সাহেবকে, আনবার জন্য লোক পাঠাব। এ বিষয় তাঁ কে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলব,—তিনি যদি অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেন, তা তে আমার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই ;—বাদসার কার্য্যে প্রতিবন্ধক হওয়াটা যে গুরুতর অপরাধ, তা তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে, তাঁ'র অন্তরের উত্তেজনার উপশম করে দোব। কাজী সাহেব এ ক'দিনের মধ্যে, দুবার এসে আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছেন, আমি তাঁ'র আবেদন অগ্রাহ্য করেছি। এতটা করা ত ঠিক হয় নি ! তাঁ'র কোন প্রতিবাদই এখন আমি গ্রাহ্য কর্‌বই না,—সে অবস্থায় তাঁ'র নিকট এতটা লুকচুরি করার কোনই প্রয়োজন দেখি না। কন্যা বেগম হবে, এত তাঁ'র আনন্দের বিষয় ! কন্যার অমতে বিয়ে হচ্ছে বলেইত তিনি—এ কার্য্যে প্রতিদ্বন্দ্বী সেজেছেন। বিয়ের পরে আমার মনে হয়, সবই ঠিক হয়ে যা'বে।

বাদসা সাহেবের চিন্তাস্রোতে বাধা প্রদান করিয়া, একজন প্রহরী আসিয়া, অভিবাদন পূর্ব্বক জানাইল,—"কাজী সাহেব, বাহিরে অপেক্ষা কচ্ছেন, আদাব জানিয়েছেন, তিনি হুজুরের সাক্ষাৎ প্রার্থী।"

বাদসা সাহেবের মুখ মণ্ডলে বিরক্তি ও ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তে আত্ম সংবরণ করিয়া তাঁহাকে আনিবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন।

কাজী সাহেব প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, লম্বা সেলাম করিয়া কহিলেন—"সলাম ওয়ালেকুম।"

"ওয়ালেকুম সলাম" বলিয়া বাদসা সাহেব উঠিয়া দাড়াইলেন এবং কাজি সাহেবকে আনিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া, নিজে আসন গ্রহণ করিলেন। ইহার পর নানা প্রসঙ্গে উভয়েই প্রায় পনর মিনিট কাল অতিবাহিত করিলেন

কাজী সাহেব কথা প্রসঙ্গে একটা শুভ সুযোগ গ্রহণ করিয়া বলিলেন "খোদাবন্দ! আমি বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি কথা বলবার জন্য আজ আপনার নিকট এসেছি। যে বিষয়টি আমি এতদিন গোপনে রেখে,—কয়েকটি নিরীহ প্রাণীর অশান্তির ইন্ধন যোগাতে সহায়তা করেছি, তা-ই আজ আপনার নিকট প্রকাশ করে, আমার জীবন নাটকের যবনিকা ফেলে দোব।"

বাদসা সাহেব উদ্বেগ উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাজী সাহেবের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন "তা" আপনি নিঃশঙ্কোচে বল্‌তে পারেন।"

কাজী সাহেব জড়িত কণ্ঠে বলিলেন "বাদসা সাহেব! আমার বক্তব্য, সাহাজাদার শ্রোতিগোচর করান খুবই বাঞ্ছনীয়। আর মতিয়া সেও পার্শ্বের কক্ষে বসে, আমার সমস্ত বক্তব্য শ্রবণ কর্‌বে এ হচ্ছে আমার শেষ প্রার্থনা।"

বাদসা সাহেব উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন "মতিয়া আমার প্রাসাদে অবস্থান কচ্ছে, এ সংবাদ আপনাকে কে দিল ? কে আপনাকে এরূপ সংবাদ দিয়েছে তা'র নাম আপনাকে প্রকাশ কত্তেই হবে।"

কাজী সাহেব নিতান্ত সহজ ভাবে বলিলেন কেমন করে জেনেছি, এবং কে আমাকে খবর দিয়েছে, সবই আমি আপনাকে জানায়ে দোব, কিছুই গোপন করব না। তবে মতিয়াও হোসেন যে আপনার আশ্রয়ে আছে তা আমি অবগত হয়েছি। আমার বক্তব্য শ্রবণ করলে আপনি বুঝতে পারবেন, আমি কত বড় গূঢ় রহস্য গোপন করে, মতিয়াকে প্রতিপালন করেছি, কত বড় প্রাণের টানে এবং তাকে চিরদিনের মত দাবী হারা করবার আশঙ্কায়, তা'কে এত বড় অশান্তিতে ফেলে দিয়ে, নীরবে বসে আছি ! যখন সে নিগূঢ় তথ্য গোপনে রেখে, তাদের অশান্তি স্খলনের কোনই প্রতিকার কত্তে পারিনি, এ অবস্থায় মনে করেছি, সমস্ত প্রকাশ করে দিয়ে, এক মুহূর্ত্তে সমস্ত অশান্তির অবসান করে ফেল্‌ব।"

বাদসা সাহেব কাজী সাহেবের উক্তি শ্রবণ করিয়া, বিস্ময়াবিষ্টের মতই অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন, শেষে কাজী সাহেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর, পুত্রকে সঙ্গে করিয়া বাদসা সাহেব, সেই কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, আসন গ্রহণ করিলেন। পুত্রকে আসন গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া বাদসা সাহেব কাজী সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনার কন্যা মতিয়া পার্শ্বের কক্ষে অবস্থান কচ্ছে, আপনার বক্তব্য শেষ করে ফেলুন, সেই ওখানে বসেই, সমস্ত কথা শুন্‌তে পার্‌বে।"

কাজী সাহেব একটুকুন ইতঃস্তত করিয়া, দৃঢ় স্বরে "বলিলেন খোদাবন্দ! আপনার বেগম, দলিয়ার স্মৃতি হয়ত এখনও বিস্মৃত হন নাই। আপনি তাকে সামান্য অপরাধে সাত মাস গর্ভাবস্থায় জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা করে ছিলেন, তা হয় ত ভুলে যেতে পারেন নি। দলিয়া ছিল আমার নিকট আত্মীয়া, ভাগিনী তা'র মত সৎ, সাধ্বী কর্ম্মঠা স্ত্রী লাভ করা অনেকেরই ভাগ্যে ঘটে উঠে না। আপনি তা'র সাত মাস গর্ভ উপেক্ষা করে, মৃত্যুদণ্ড দিতে দ্বিধা বোধ না করে থাক্‌লেও, মৃত্যুক্ষণ পর্য্যন্ত সে আপনার ধ্যান করেছে। তার পতি অনুরাগ পূর্ণ উক্তি গুলি শুন্‌লে, নিতান্ত পাষাণও হয়ত গলে যেত। সে যাক পরের কথা পরে বলব। তা'কে যখন জীবন্ত সমাধির জন্য কবরের নিকট দাঁড় করান হয়, আমি তখন সে স্থানে উপস্থিত ছিলাম। সে—সেই শেষ মুহূর্ত্তেও আপনার অশেষ গুণ কীর্ত্তন করে আমাকে বল্‌ল্—মামু! বাদসার আদেশ আমি হাসি মুখে প্রতিপালন কত্তে প্রস্তুত হয়েছি। তবে আমার গর্ভে বাদসার স্মৃতিচিহ্ন যে বিদ্যমান রয়েছে! কি দোষে গর্ভস্থ শিশু আমার ন্যায় শাস্তি ভোগ কর্‌বে? তাঁ'র স্মৃতি চিহ্নটুকুন যাতে নষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থা করে দিন। প্রসবের পর আমি স্বহস্তে আমার জীবন লীলা শেষ করে ফেল্‌ব,—এ বিষয়ে আমি প্রতিজ্ঞা কত্তে প্রস্তুত আছি। বাদসা সাহেব তা'র সেই কাতর বিলাপ শ্রবণ করে, আমি স্থির থাক্‌তে পারি নি, আপনিও হয়ত পার্‌তেন না। আমি তা'কে আমার বাড়ীতে নিয়ে প্রতিপালন করেছি। এদিকে প্রকাশ করে দিয়ে ছিলুম, দলিয়ার জীবন্ত সমাধি হয়ে গেছে! তা'রপর বাদসা সাহেব! দশ মাস অন্তে, দলিয়া মতিয়াকে প্রসব কর্‌ল। যে দিন মতিয়ার জন্ম হয়, তা'র পরদিন আমারও একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্য বশতঃ জন্মের দু'দিন পরেই, আমার সে কন্যার মৃত্যু হয়। আর আমার কোন সন্তানাদি হয় নি। আমি এখন নিঃসন্তান! আমার স্ত্রী, সেই কন্যা হারিয়ে একেবারে পাগলের ন্যায় হয়ে গেল। দলিয়া আমার স্ত্রীর অবস্থা দেখে খুবই বিচলিত হয়ে গেল। সে বল্‌তে লাগল, দুনিয়ার সবই রহস্য পূর্ণ। কেউ সন্তানকে জীবন্ত কবরে দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, আবার কেউ একটি সন্তানের জন্য জীবন্মৃত হয়ে থাকে। এ ঘটনার পাঁচ সাত দিন পর, একদিন অতি প্রত্যুষে—গাত্রোত্থান করে দলিয়া শয়ন কক্ষে গিয়ে দেখলুম দলিয়ার দেহ হইতে প্রাণ বায়ু বাহির হয়ে গিয়েছে! তা'র হাতের লেখা একখানা চিঠি এ শয্যায় পড়ে ছিল, তা' পাঠ করে জান্‌লুম, সে বিষ খেয়ে সকল যন্ত্রণার অবসান করেছে। সে হ'তে বাদসা সাহেব! মতিয়া আপনার কন্যা হলেও, কন্যা স্নেহে তাকে আমি প্রতিপালন করে এত বড় করে তুলেছি। সাহজাদার সাথে তা'র বিয়ে অসম্ভব, তাই আমি এতদিন সে কথাই বলে আস্‌ছিলুম, আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে, এ বিবাহে বাঁধা দিতে চেষ্টা করেছি। স্নেহের আতিশয্যে আমি যা করেছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন। মতিয়া আজ আর আমার কন্যা নয়, বাদসার কন্যা, রাজ্যের আংশিক অধিকারিনী! বলিয়া কাজী সাহেব বস্ত্রাঞ্চলে নেত্র আচ্ছাদন করিয়া, বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন!

কাজী সাহেবের উক্তি শ্রবণ করিয়া, বাদসা সাহের অন্তরে, ভীষণ পরিবর্ত্তনের স্রোত বহিয়া গেল। এক অপ্রত্যাশিত বিবেক—আলোড়নের প্রেরণায়,—তাঁহাকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া, আবার নূতন করিয়া গঠিত করিয়া দিল। এক গুরুভারাতুর, অথচ অনুপায় হেতু ক্ষোভে জর্জ্জরিত হৃদয় মন লইয়া,—তিনি অসীম অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। বাদসা সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া থাকিয়া, জড়িত কণ্ঠে বলিলেন "কাজী সাহেব! এ সমস্ত ব্যাপার সবই যে আমার নিকট হেয়ালি বলে মনে হচ্ছে!"

কাজী সাহেব কথায় বাধা প্রদান করিয়া, শান্ত ও স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন "বাদসা সাহেব! হেয়ালীর কিছুই নেই এর ভিতর! সবই সত্য,—খাটী সত্য! এই দেখুন—দলিয়ার স্বহস্তের লিখিত শেষ চিঠি,—এ লেখা আপনার হয়ত খুবই পরিচিত! এ চিঠি পাঠ করলেই, আপনার সমস্ত সংশয় দূর হয়ে যাবে।" বলিয়া কাজি সাহেব, স্বীয় জামার পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া, বাদসা সাহেবের হস্তে প্রদান করিলেন।

বাদসা সাহেব আগ্রহাতিশয্যে চিঠি খানা গ্রহণ করিলেন এবং পর মুহূর্ত্তে পত্রখানা পাঠ করিতে লাগিলেন :—

হয়ে উঠে! তা কে আমি বিশেষভাবে পুরস্কৃত কর্‌ব, এরূপ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি!'

কাজী সাহেব কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিলেন "খদাবন্দ! যে এ সংবাদ প্রেরণ করেছে, সে আপনার প্রাসাদে আজ বন্দী। তা'র নাম আমিনা।"

আমিনার নাম শ্রবণ করিয়া বাদসা সাহেব সবিস্ময় শ্রদ্ধাতিশয্যে একেবারে গম্ভীর হইয়া গেলেন। দারুণ মনস্তাপে তাঁহার বিশাল বক্ষস্থলে বজ্রসূচী বিদ্ধ করিয়া দিল। তিনি ক্ষোভ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "কাজী সাহেব! আমিনা আপনার কি হয়।"

কাজী সাহেব বিনীত কণ্ঠে বলিলেন "আমিনা আমার পালিতা কন্যা। বাল বিধবা, আমি তা'র একমাত্র অবলম্বন। মতিয়া ও হোসেন অপহৃত হবার পরদিনই,—সে গোপনে আমার আশ্রয় পরিত্যাগ করে, আপনার অন্দরে প্রবেশ করেছে। মতিয়া ও হোসেনকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যেই হয় ত সে আপনার প্রাসাদে বাস কচ্ছে। আমি অনেক চেষ্টায়ও এতদিন তা'র সন্ধান কত্তে পারিনি। কাল তা'র একখানা চিঠি পেয়ে আমি সমস্ত অবস্থা অবগত হয়েছি।

বাদসা সাহেব একটি দীর্ঘশ্বাস প্রদান করিয়া, আসন পরিত্যাগ করিলেন, এবং মতিয়াকে কাজী সাহেবের সহিত অবস্থান করিতে অনুরোধ করিয়া অসীম খেদের সহিত বলিলেন "হায়! এ প্রসঙ্গে আমি কত অশুভ অনুষ্ঠানেরই না সহায়তা করেছি! আমি এ মুহূর্ত্তেই আমিনাকে,—স্বহস্তে মুক্ত করে দিচ্ছি।" বলিয়া বাদসা সাহেব, আমিনার কারা কক্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন। (ক্রমশঃ)

হাসি-কান্না

(শ্রীদেবেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ)

কাল গেল মোর বিয়ে!
শোভন রাত্রির বাড়ীর আলোর ঝল্‌সে ছিল হিয়ে!
আর্শিখানি ধর্‌ছি হাতে,
হলুদ বরণ গাম্‌ছা সাথে,
ভুল সবাই আমার মাথায় সোণার টোপর দিয়ে।

ঢোল কাঁসী আর বাজল সানাই,
হাসি কৌতুক করল সবাই,
কনের বাড়ী গেলাম আমি পাল্কীর উপর চ'ড়ে,
সোহাগ ভরে নারীদলের হুলুধ্বনি পড়ে।
মাঙ্গলিক সেই পূর্ণ কলস
দিল প্রাণে কতই হরষ্!
র'ম কদলীর তোরণ দ্বারে দুল্‌লো ফুলের মালা;
তার তলেতে সাজিয়ে ছিল বালার বরণ ডালা।

আজ্‌কে ভীষণ বেশ!
মাথারভূষণ তুল্‌সী গাছ আর ছেড়া কাঁথা শেষ!
সংসারে ভাই এই ভেল্‌কী,
আজ্‌কে বাঁধে বাঁশের পাল্‌কী,
শত্রুভাবে শোয়ায় তা'তে হরিধ্বনি দিয়ে,
ঐ মিশে যায় চিতার ধোয়ায় আমার সাধের বিয়ে!

তা'য়ে ভা'য়ে বিষম দ্বন্দ্ব
দৈবে মোদের হলো বন্ধ,
অঙ্গার হয়ে বরাঙ্গ মোর ভাস্‌ল নদীর জলে!
শ্মশান ঘাটে সে ঘট রাজে নেক্‌ড়া পাটের তলে!

বারবেলার ভূত

(শ্রীসতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী।)

শনিবারের বারবেলায় নিজ ব্যবসার গৃহে বসিয়া পত্র লিখিতেছিলাম, এমনি সময়ে এক মুখ চেনা প্রতিবেশী আসিয়া বলিলেন—"কব্‌রেজ মশাই একটু উঠুন।"

"কেন, বলুন ত?"

সে ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন,—"আমার ভগ্নিটী যেন কেমন কচ্ছে, একটু না দেখলেই নয়।"

সে দিনটায় আমার ব্যবসায়টী বড়ই মন্দা ছিল। তাই, এই বারবেলার ডাকটীও যেন একটু আশ্বস্ত করিল। কিন্তু যাত্রা করিয়া পা বাড়াইতেই চর্ম্মপাদুকার একখানা যখন

তাই কথাটা ঐ খানেই বন্ধ করিয়া বলিলাম "দেশ ছিল কোথায় ?'

"ফরিদপুর জেলায়।"

"তুমি জাতিতে কি ছিলে ?

"কায়েস্থ !"

"নাথ ?"

মাধ্যমিক একটু দৃঢ় অথচ ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, না বলব না, কিছুতেই বলব না তুমি বড় চতুর। কোন দিক্ দিয়ে আবার সেই কথাই বের করে নেবার চেষ্টা কচ্ছ !"

আমি বলিলাম "বল্লে দোষ কি ?"

"দোষ কিছুই নেই, তবে বড়, ব্যথাট জেগে উঠবে। তাই আমার আপত্তি।

"তোমার সব পরিচয় দাও, আমরা তোমার পিণ্ড দিয়ে উদ্ধার করে দেব।"

মাধ্যমিক এবার তাহার চক্ষের তারা দুটী বেশ উজ্জ্বল করিয়া আগ্রহের সহিত বলিল "পারবে আমার সকল গোষ্ঠীর পিণ্ড দিতে ? তা'হলে নাম গোত্র সব বলত, আর তোমাদের রোগীকেও জন্মের মত ছেড়ে যেতে পারি। কিন্তু তাতেও যেন আমার দুঃখ হবে মনে হচ্ছে।"

"কেন ?"

মাধ্যমিক তখন বুকে হাত দিয়া বলিল, এই লোকটার তাতে বড় কষ্ট হবে। যদিও তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওর খুবই একটা কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু রোগী তাতে কোনই কষ্ট বোধ করে না। বরং সময় সময় আমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলে নিজের দুঃখটাই লাঘব করে নেয়।"

শুনিয়া রোগিনীর ভ্রাতা আগ্রহের সহিত বলিল "তা" হলে রোগী তাহাকে দেখতে পায় ?

হাঁ পারে বৈ কি।"

আমি বলিলাম "এতই যদি তুমি বান্ধব, তবে নামটা বল্লে দোষ কি ?"

"দোষ কিছুই নেই। তবে সকলেরই মনে একটা শক্ত ব্যথা পাবে।" বলিয়াই আমাদের কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মাধ্যমিক বলিল তোমাদের রোগীর স্বামীর বাড়ী ছিল কোথায় ?

রোগিনীর ভ্রাতা বলিল তা' শুনে তোমার কি লাভ।

মাধ্যমিক হাসিয়া বলিল তোমরা দেহী, লাভ লোক-সানের হিসাব তোমরা গে খতাও। আমার লাভ একটু জানা মাত্রই।

ইহার পরে অনেকক্ষণ অবধি আর কেহই কোন কথা বলিল না। কিন্তু মাধ্যমিক কেমন একটা অস্বস্তির ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। খানিকপরে মাধ্যমিককে প্রশ্ন করিলাম—তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে ?

মাধ্যমিক কেমন একটা মুখভঙ্গী করিয়া বলিল—"আমার কোন কষ্টবোধ নেই। কিন্তু"—

"কিন্তু কি ?

ইহার কোনই জবাব না দিয়া আমাকে বলিল--তুমি আজ যাও।

"কেন ?"—"কেন তা পরে নিজেই বুঝতে পাবে।"

মাধ্যমিকের মনের ভাব কিছুই বুঝিলাম না। তাই একটু আগ্রহের সহিত বলিলাম—"একটু খুলেই বল না ?"

"এখানে আর কিছুকাল থাকলে একটা বিপদের অংশ অনিচ্ছায় ঘাড় পেতে নিতে হবে।"

"আমারও কোন বিপদ হবে ?"

"না, তবে একটু লাঞ্ছনা সইতে হবে। অনেক কাজ নষ্ট হবে।

এ ঘরে অনেক লোক জমিয়াছিল। এই ভবিষ্যৎ সংবাদটা শুনিয়া সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। এবং এক ব্যক্তি অগ্রণী হইয়া একটু উপহাসের সুরে বলিল - আরে মশাই ! গেয়ে ভূতের কথা রেখে দিন্। ওসব ফাকাবাজি, মিথ্যা কথা !

শুনিয়া মাধ্যমিক চট্ করিয়া বসিয়া, সেই বক্তা ভদ্রলোকটিকে এমন একটা অপ্রিয় সত্যকথা বলিয়া ফেলিল, যাহা শুনিয়া নিমেষ মধ্যে তিনি মাথা গুজিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। আর মাধ্যমিক একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—যাক্ বাঁচা গেল। হারামজাদা পালিয়েছে।

আমি বলিলাম—তা হ'লে এখন বোধহয় আর আমাকে যেতে হবে না ?

"না"

"কেন বল ত ?

সৌরভ—

স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত এম. বি. ই.

সৌরভ প্রেস—ময়মনসিংহ।

বর্ত্তমান সমস্যা

(শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ)

দেশের প্রাণ আজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বত্রই এইরূপ একটা ভাব জাগিয়াছে যে যাহা চলিতেছে, যে ভাবে আমরা রহিয়াছি, ইহাতে আর তৃপ্তি নাই। যে বিধি নিষেধ সমূহ বর্ত্তমান পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছে, তাহা এক্ষণে অসংখ্য বন্ধন-পাশেই পরিণত হইয়াছে এবং এইসকল ছিন্ন করিতে না পারিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে সর্ব্বদাই তাই দেখি তরুণের বিদ্রোহ অভিযান। এখনকার কথাবার্ত্তায় কোনও রাখা-টাখা ভাব আর নাই। মনোভাব আজ বেপরোয়া ভাবেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। সমাজের উপর দণ্ডধারী যে শক্তি এতদিন রাজত্ব চালাইয়া আসিয়াছে, সমাজের শৃঙ্খলা ও নিয়ম অব্যাহত রাখিয়াছে, আজ জরার অবশ্যম্ভাবী দৌর্ব্বল্য তার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে। কালপুরুষের ঘণ্টাধ্বনি তাহার কর্ণরন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—সে আজ তাই সন্ত্রস্ত, ভীত। সে বুঝিয়াছে যে তার দিন ফুরাইল বলিয়া। তাই দৌর্ব্বল্যের অস্ত্র নিস্ফল ক্রোধের শেষ আস্ফালনে সে খানিকটা সোরগোল তুলিয়া নিজের ব্যর্থতা ঢাকা দিবার নিরর্থক প্রয়াস করিতেছে, যদিও মনে মনে ভালরূপেই জানিয়াছে যে এবার তার রাজত্বের অবসানপ্রায়।

তরুণ আজ যে এত বেপরোয়া তার অর্থও তাই। তরুণও বুঝিয়াছে তার উপর অত্যাচারের যে বজ্রমুষ্টি এতদিন ধরিয়া নিয়ত উদ্যত ছিল, কালপ্রভাবে আজ তাহা শিথিল প্রায়। তবে আর ভয় কি? বিদ্রোহের রণরঙ্গে তরুণের দল আজ তাই মাতিয়া উঠিয়াছে, বিদ্রোহের মন্ত্রসঞ্চারিত করিয়া দিতেছে দেশে দেশে দিকে দিগন্তরে। এই মন্ত্র যে দারুণ অনল সৃষ্টি করিবে তাহাতে সমাজের জীর্ণ কারাগার পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

কিন্তু তরুণের এই যে বিদ্রোহ-মন্ত্র হহার অর্থ তাঁহারা নিজেরাই কি ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন? তাঁহারা কি জানেন কেন এই ধ্বংসের আয়োজন? কি চান তাঁরা? তরুণ যদি সরল হন তবে বলিতে বাধ্য হইবেন "কি চাই তা: জানি না। কিন্তু যা' আছে তা' চাই না।" এক কথায় তরুণের সামনে আজ স্থির লক্ষ্য কিছু নাই। সে চলিয়াছে কক্ষচ্যুত গ্রহের মত এক আত্মহারা আবেগে, যাহাকে সাম্‌নে পাইবে তাহাকেই ধ্বংস করিবে, নিজেও ধ্বংস হইবে।

যুগসন্ধির সময়ে একটা বিপ্লব, একটা উলট্ পালট্ যে অনিবার্য্য সন্দেহ নাই—কিন্তু প্রলয়ের সার্থকতা তখনি যখন সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর ও মহত্তর নব সৃষ্টির আয়োজন চলিতে থাকে। তরুণেরা কিন্তু এদিক্‌টা ভাল করিয়া দেখিতেছেন না। যে কোনও আদর্শ যে দিক হইতেই আসুক সেইটিরই পিছনে পিছনে তাঁরা ধাবমান হন। কিছুদিন অহিংস খদ্দরব্রত চলিল, এক্ষণে রুশিয়ার সাম্যমূলক শূদ্রধর্ম্ম এক অভিনব মোহের হাত ছানিতে তাহাদের প্রাণে সাড়া তুলিতেছে। কমিউনিজম্, বল্‌শেভিয়জম্ রুশিয়ার জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের তাড়নায় জাগিয়াছে। তা' আজও চূড়ান্তরূপে পরীক্ষিত হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। যাই হোক তবু তাহা রুশিয়ার জাতীয়াত্মার একটি সত্যকার প্রকাশ চেষ্টা। কিন্তু ভারতবর্ষের জাতীয় গঠন অন্যরূপ। তাহার অভাবও অন্য ধরণের। ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসের দিকে একেবারে লক্ষ্যহারা না হইলে শুধু অতীত ইতিহাস কেন ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির প্রতি একটু অবধান করিলেও ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির সূক্ষ্ম গতির দিকে চক্ষু মেলিয়া তাকাইলে কখনও আমরা রুশিয়ার ব্যর্থ অনুকরণে এত মাতিয়া উঠিতাম না। রুশিয়া কেন অপর কোনও দেশেরই অন্ধ অনুকরণে ভারত-উদ্ধার হইবে না। অন্যান্য দেশের যাবতীয় সমস্যার সমাধান সমূহে আমরা অন্ধ হইব না, ভারতবর্ষের উপযোগী যাহা তাহা আবশ্যক মত গ্রহণও করিতে হইবে। অথবা যে সব সত্য সার্ব্বজনিন, যাহা সংকীর্ণ দেশ ও কালের মধ্যে আবদ্ধ নহে, যে সকল সত্যের আবিষ্কারের মানবের জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমসমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, এমন সব সত্য সব দেশ হইতেই আমরা লইতে পারি, কিন্তু সজ্ঞানে ও প্রয়োজনানুযায়ী চৌদিক হইতে সত্য ও শক্তি আহরণ করা, আর যাহা সাম্‌নে পাওয়া যায় অন্ধভাবে তাহাই গলাধঃকরণ করা—এ দুইয়ে প্রভেদ অনেক। আজ কালকার অতি আধুনিক এক সম্প্রদায় এই শেষোক্ত পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন।

দুই হস্তে শোভিয়াছে কনক কেয়ূর।
দুই পদে শোভিয়াছে কনক নূপুর॥
অভয় বরদা দেবী সকরুণা হয়।
অনুগত জনেরে পালয় সদায়॥
ব্রহ্মা. বিষ্ণু, মহেশ্বর, দেব সুরপতি।
চরণে পড়িয়া যাঁহার নিত্য করে স্তুতি॥
সহস্র মুখেতে নহে গুণের কথন।
তাকে কি কহিব আমি মনুষ্য অধম॥
পৃথিবীতে আছে রাজ্য উজানী নগরী।
বিক্রম কেশরী নাম তথা নরপতি॥
সেহি দেশে বৈসে সাধু নাম ধনপতি।
লহনা খলনা তার দুই যুবতী॥
বিধির নির্ব্বন্ধে সে না হইল ভাগ্যবতী।
দুর্ভাগা হইল তার খুলনা যুবতী॥
পতি সনে খলুনার নাহিত পীরিতি।
আর এক দিনে সেহি সাধুর বচনে।
খলুনাকে নিয়োজিল ছাগল রক্ষণে॥
ছাগল হারাইয়া কন্যা ভ্রমে বনে বনে।
জুকারের শব্দ কন্যা সেহি বনে শুনে॥
জুকার উদ্দেশে চলে খলুনা যুবতী॥
মঙ্গল চণ্ডিকা. বলে শুন নরপতি।
যদি রক্ষা চাও তুমি রাজ্য সঙ্গতি॥
কালকেতু নামে ব্যাধ হয় মোর দাস।
বন্ধন মোচন কর পূর তার আশ॥
ই বলিয়া দেবী তবে রাজা বিদ্যমান।
সেবক বৎসলা দেবী হইলা অন্তর্দ্ধান॥

* * * *

মঙ্গলচণ্ডী দেবীর বরে কালকেতু নামক ব্যাধ বহু ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার শত্রুপক্ষ তদ্দেশের সহস্রাক্ষ নামক রাজার নিকট কালকেতু সম্পত্তি নানা প্রবঞ্চনা করিয়া লাভ করিয়াছে এক অভিযোগ করায় রাজ আদেশে ব্যাধবর বন্দী হইলেন, কবি ঐ স্থানে অতি মর্ম্মস্পর্শি ভাষায় ঐ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

লাচাড়ি

কান্দে ব্যাধ সকরুণ মন, তুমি মোকে দিলা ধন,
তাতে কেন বিড়ম্বন, প্রাণ রাখ হইনু কাতর।
মনে অতি বাসি -- ভয়, বন্ধন অতি গুরুতর,
মোচন চণ্ডী করহ সত্বর।
মুঞি না দেখিব আর, স্ত্রী পুত্র পরিবার,
কামিনী আর না লইব কোলে।
মৃগগণের সাঁপে মোর, বিধি দিল দুঃখ ঘোর,
কান্দে ব্যাধ সকরুণ সুরে।
কহে দ্বিজ জনার্দ্দন, শুন ব্যাধের নন্দন,
কালি হবে তোমার মোচন।

দ্বিজ গঙ্গাদাস যে পাঁচালী রচনা করিয়াছেন এই স্থানে তাঁহার ভাব এরূপ সুন্দর হয় নাই পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য "গঙ্গাদাস কৃত পাঁচালীর" কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

কালিঙ্গ রাজ্যের রাজা ব্যাধ ছিল তার প্রজা
শুনিয়া বান্ধিয়া তাকে নিল।
বন্ধিয়ানে থাকি ব্যাধ, মনেতে ভাবি বিষাদ,
চণ্ডিকারে শরণ করিল।
শুন দেবি মহেশ্বরি নিজ গুণে দয়া করি,
এবে কেন হইলা নিদয়া,
তুমি মুকে দিলে ধন, তাহাতে হইল বন্ধন,
রক্ষা কর ভবানী ভব জায়া।
ব্যাধের স্তবন শুনি, অকস্মাৎ দৈববাণী,
না কান্দ না কান্দ ব্যাধ জন,
বন্ধন মোচন হবে, এ দুঃখ নাহিক রবে,
রাজা দিবে আর কিছু ধন।

প্রথিত যশা মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীর উপাখ্যান অবলম্বনে দ্বিজ জনার্দ্দন কর্তৃক এই ক্ষুদ্র সন্দর্ভটী পয়ার ও লাচাড়ী ছন্দে বিরচিত। এদেশে মঙ্গলচণ্ডিকার—ব্রতোপলক্ষে ঘরে ঘরে পাঁচালী পঠিত হইয়া থাকে। রচনা সৌন্দর্য্যে এই পুঁথিখানি রচয়িতার উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তির নিদর্শন। দুঃখের বিষয় অনুসন্ধিৎসুলোকের অভাবে "জাতীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের যে এইরূপ কত অমূল্যনিধি

পল্লীতে পল্লীতে বহু "মহিলা সমিতি" তাঁহার স্মৃতি বুকে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছে।

এখানি জাপান ভ্রমণের কাহিনী। জাপানের শিক্ষা দীক্ষা, স্কুল, কলেজ, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি যাবতীয় অভিজ্ঞতা "রোজ নামচার" ভিতর দিয়া তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। আজকাল দেশ ভ্রমণ একটা ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিন্তু এই মহিলা যে আকাঙ্ক্ষা ও উৎসুক লইয়া দেশ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন তাহা অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ হিন্দু মহিলার পক্ষে। তিনি ভ্রমণ কালে যে সমাজে মিশিয়াছেন তাহাদের যাহা কুৎসিৎ অনাচার তাহা নির্ভিক ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন আবার যাহা ভাল দেখিয়াছেন তাহার শতকণ্ঠে প্রশংসা করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। যখন কিছু তাঁহার নারী হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে, তখনই তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন—"আমাদের দেশের ভদ্র মহিলারা কোথাও কিছু দেখ্‌তে গেলে যেমন ছেলেপিলে সঙ্গে নিয়া যান জাপানের মেয়েরাও তাদের ছেলেপিলে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন কিন্তু এক ঘরে এতগুলি ছেলেপিলে থাকা সত্বেও একটু গোলমাল শুনা গেল না। এদের ছেলেপিলেদের বিশেষত্ব যে আমাদের দেশের ছেলে-পিলেদের মত তারা কান্নাকাটি বা গোলমাল করে না। এদের মেয়েরাও সব চুপ চাপ বসে আছে বা আস্তে আস্তে কথা বলছে। এরা এত সংযত যে এত স্ত্রী লোক একত্রে বসে আছে অথচ জোরে হাসতে বা জোরে কথা বলতে কাউকে দেখলাম না। যাদের মেয়েরা এ রকম সংযত তারা যে সংযম শিক্ষা করে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আমাদের দেশের শিক্ষিত মহলেও একত্রিত হলে ঠাট্টা কথা বার্ত্তার এত গোলমাল বাধান যে, যে শিক্ষা লাভের জন্য গেছেন বা যা কিছু উপভোগ করার জন্য গেছেন তার উপর অনেক সময় দৃষ্টিই থাকে না। আর আমাদের শিশুরা অকারণে বা সামান্য কারণে কান্নার রোল তোলে।

* * * * *

আমরা যে দিন জাপানি মাতাদের মত সংযত হয়ে সন্তানদের সংযম শিক্ষা দিতে পারব, সেই দিন আমাদের দেশেও উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে।"

অন্যত্র—"আমাদের দেশে বই পড়িয়ে মুখস্থ করিয়ে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু জাপানীরা বই পড়ার সঙ্গে হাতে কলমে দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিক্ষা দিচ্ছে। কি সুন্দর শিক্ষা প্রণালী! মিসেস্ সুকা মটোর কাছে জানা গেল যে, মেয়েরা রোজ পড়া শেষ করে বাড়ী যাবার পূর্ব্বে পালা পালি করে তাদের স্কুল ঘরগুলি ধোয়। এ কাজের জন্য অন্য চাকর রাখা হয় না। আমাদের দেশে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না, সেজন্য মেয়েরা লেখা পড়া শিখলেই অত্যন্ত সৌখিন হয়ে দাঁড়ায়। এমন কাজ স্কুলে করতে দিলে আমাদের মেয়েদের অভিভাবকরা হয়ত তাকে অত্যন্ত অন্যায় মনে করেন; কিন্তু এতে যে মেয়েদের চরিত্রের কত উন্নতি হয় তা ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। এই সব শিক্ষার প্রভাবেই জাপানী মেয়েরা এত উচ্চ শিক্ষা সত্বেও নম্রতা বজায় রাখে। মেয়েরা স্কুলে ঘরের কাজ শিক্ষা করছে আবার লেখা পড়াও শিক্ষা করছে। এই রকমে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নম্রতা বজায় রাখতে শিক্ষা করাই নারীর আদর্শ শিক্ষা হায় আমাদের অভাগা দেশের কবে চক্ষু খুলবে! কবে আমরা এমন ভাবে মেয়েদের শিক্ষা দিতে শিখব? যে দিন আমরা আমাদের দেশের বালিকাদের এমনি যত্ন করে শিক্ষা দিতে পারব সে দিন এখনও কি অনেক দূরে আছে? যা হোক শিক্ষায় আমরা এখনও যে কত পশ্চাদপদ তা এই রকম স্কুল দেখলে ভালরূপ অনুভব করতে পারা যায়। শিক্ষা মানুষের যে কি পরিবর্ত্তন করতে পারে তা এ দেশে এলে বোঝা যায়।" ইত্যাদি—

লেখিকার স্বদেশ প্রীতির নিদর্শন পুস্তকের ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ গ্রন্থ ভাষার সম্পদ। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় লেখিকা তাঁহার রচনাগুলি পুস্তকা-কারে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

অবশ্যি প্রকৃত শিক্ষায় কি বুঝায় তা বুঝতে এখনও আমাদের অনেক দেরী আছে। শিক্ষার মানে শুধু বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাওয়া নয়, বি, এ, এম, এ পাশ করলেই শিক্ষার সমাপ্তি হয় না। জীবনের প্রতিদিন এমন কি মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত জ্ঞানানুশীলন করাই প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষা মানে কয়েক খানা বই পড়া নয়, স্কুলের শিক্ষা সোপান মাত্র। আসল শিক্ষা কি তা বুঝতে আমাদের এখনওঅনেক দেরী আছে। এখন আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে, বয়স্থা মেয়েদের গার্হস্থ্য শিক্ষা দেওয়া; আর যে সব মেয়েরা গৃহিণী তাঁদের পাকা গৃহিণী হতে শিক্ষা দিতে হবে। পৃথিবীর সবদিক থেকে সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ছেলেমেয়েদের সকলকেই Nursery থেকেই শিক্ষা দিতে হবে, বয়স্থা মেয়েরা যাঁরা তাঁরাই হবে দেশের গৃহিণী। তাঁদের শিক্ষা কেবল বি. এ, এম, এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না; তাঁদের প্রকৃত গৃহিণী হতে শিক্ষা দিতে হবে। এ কথাটাই আমাদের দেশ এখনও বুঝছে না।

Canada, Belgium, Japan, England, Holland প্রভৃতি দেশে শিল্প শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, ঘরকন্না শিক্ষা গোপালন শিক্ষা, প্রভৃতি দেওয়ার জন্য একদিকে স্কুল কলেজ আছে অন্য দিকে মহিলা সমিতি গঠন করা হয়েছে। অন্যান্য জাতির সঙ্গে আমাদের সমকক্ষ হতে হলে সকল বয়স্থা মেয়েদের Domestic science বা গৃহ-স্থালী বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ভগবান যে নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন, সেই সব নিয়ম ও জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার নূতন নূতন আয়োজন কর্ত্তে হবে। আর দিতে হবে Home making শিক্ষা, ঘরকে কি করে সমৃদ্ধ করতে হয় সেই শিক্ষাই দিতে হবে।

আমি বেলজিয়মে গিয়াছিলাম সেখানে বয়স্থা মেয়েদের স্কুলে মেয়েরা লাঙ্গল চালায়। তাহারা গো পালন করছে, তারাই প্রকৃত দুহিতা। সেখানে মেয়েদের College of domestic science আছে। সেখানে Farm management training দেওয়া হয়; আমাদের দেশের স্কুলে বড় বড় বাগান থাকবে। সে সব বাগানে বয়স্থা মেয়েরা সব্জি উৎপন্ন করবেন। স্কুলে মেয়েরা গো পালন শিখবে, কি করে গরু দুইতে হয়! কি করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করলে খাদ্যে সার ভাগ বেশী থাকে এবং কোন খাদ্যে কি সার এবং কিসে সে সার বজায় থাকে ঐ সব সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

ইউরোপের মেয়েরা স্কুল কলেজে শিখে কি করে রান্না করতে হয়, কি করলে রান্না ভাল হয় ও রান্নায় সার থাকে। আমাদের মেয়েদেরও তেমনি শিখাতে হবে।

ইউরোপ এমেরিকায় যদি কোন বাড়ীতে কেবল বাজারের জিনিষ দিয়ে ঘর সাজান হয় তবে সেটা অসভ্যতার, সেটা অশিক্ষিতের পরিচয়।

সে সব দেশের মেয়েরা কাপড় বুনতে শিখে, কম্বল বানাতে শিখে, খেল্না তৈরি করতে শিখে, বাড়ী ঘর মেরামত করতে শিখে, আর আমাদের দেশে কেবল নিচ্ছে, কিছু দিচ্ছে না। কেবল কিন্ছে, কিছু তৈরী কর্ছে না। যে দেশ যত বেশী দরিদ্র, সে দেশ তত বেশী নেয়, দেয় না।

জাতীয় জীবন কি করে গড়ে তুল্তে হয়, মেয়েরা তা শিখবে। আমি বলি মেয়েদের শিক্ষা হোক, পুরুষদের কথা ভুলে যান। মেয়েরা সুশিক্ষিতা হলে পুরুষরাও তাঁদের কাছ থেকে উদ্দীপনা লাভ করবে। মেয়েদের শিক্ষায় বড় করে তুল্তে পারলে তো আমরা বীরের জাতি।

হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে মেয়েদের শিক্ষা দিতে হলে গ্রামে গ্রামে মহিলা সমিতি গঠিত হওয়ার দরকার। মহিলা সমিতি মানে মেয়েদের একত্র সম্মিলন। তাঁদের কথাবার্ত্তা ভাবের আদান প্রদানের ভেতর দিয়ে একটা শক্তি গঠিত হয়। তার ভেতর দিয়ে তাঁদের মনে একত্র হয়ে কাজ করবার একটা প্রেরণা আসে। মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা মেয়েরাই দিবে। মেয়েরাই স্থানে স্থানে প্রাথমিক কেন্দ্র স্থাপন করবে, কিন্তু দেশের বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাজ কর্তে হবে। ভাগ ভাগ হয়ে নয়। ভাগ ভাগ হয়ে কোন কাজ হয় না। United we stand divided we fall. যার বাংলা আমি করেছি "একজোটে জয়, বিভক্তের ক্ষয়।" মেয়েদের মধ্যে হবে কেবল যোগ, বিয়োগ নয়। আমরা আমাদের সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করে একত্রে আমাদের চলার পথে চলব। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারলে লাভ, এই যে মায়ের জাত একা হয়তো কেউ ভুল করে বস্তে পারে, বিপথে চলতে পারে, কিন্তু সংঘবদ্ধ হয়ে চল্লে ভুল করবার ভয় খুব কম। কাজেই

যন্ত্র ও উহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার অসামান্য বুদ্ধি ও প্রতিভার প্রশংসা করিলেন। ইহা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি মোর্সের সাধু উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করিলেন না। কয়েক বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মোর্স যাহা উপার্জ্জন করিলেন তাহা স্বীয় যন্ত্রের উন্নতি সাধনের জন্য ব্যয় করিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা স্থানে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন। কয়েক বার গবর্ণমেণ্ট মোর্সের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। নূতন আবিষ্কারের উপকারিতা মানুষ সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না। আবিষ্কারককে সকল দেশেই নৈরাশ্যের ভিতর দিয়া সফলতা লাভ করিতে হয়। অনেক চেষ্টার ফলে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের গবর্ণমেণ্ট মোর্সের যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের জন্য একটী টেলিগ্রাফের লাইন খুলিলেন। এত দিনে দরিদ্র বৈজ্ঞানিকের আশা পূর্ণ হইল, তাঁহার শ্রম সার্থক হইল। এই লাইনে মোর্স প্রথম সংবাদ প্রেরণ করিলেন "ভগবান্ কি আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিয়াছ"। সেদিন মোর্সের হৃদয়ে যে আনন্দ হইয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসাধ্য।

এই সময়ে মোর্সের এক নূতন বিপদ দেখা দিল। মোর্সের যন্ত্রের সফলতা দেখিয়া জেক্‌সন্ নামক আমেরিকার এক জন অধিবাসী প্রচার করিলেন যে তিনিই প্রথম তাড়িত বার্ত্তা প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন; মোর্স তাহার উদ্ভাবিত যন্ত্র ও বর্ণমালা দেখিয়া তাহার অনুকরণ করিয়াছেন। জেক্‌সন্ এই কথা প্রচার করিয়াই নিরস্ত হইলেন না। তিনি তাহার দাবী প্রমাণের জন্য আদালতের অশ্রয় লইলেন। জেকসনের তাড়িত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ছিল না। সুতরাং টেলিগ্রাফের যন্ত্র উদ্ভাবন করা ত দূরের কথা উহার কার্য্য প্রণালী বুঝিবার শক্তিই তাহার ছিল না। আদালতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ জেক্‌সন্‌কে টেলিগ্রাফের যন্ত্রের সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন কিন্তু জেক্‌সন্ তাহার কোন উত্তর দিতে পারিল না। মোর্স অনায়াসে পণ্ডিতদিগের প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার যন্ত্রটী খুলিয়া উহার প্রত্যক অংশের ক্রিয়া এবং তাড়িত বার্ত্তা প্রেরণের প্রণালী সকলকেই অতি সরল ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। মোর্স জয় লাভ করিলেন। তিনিই টেলিগ্রাফ্ যন্ত্রের ও সাঙ্কেতিক বর্ণ মালার আবিষ্কারক বলিয়া বিচারক নির্দ্ধারণ করিলেন। মোর্সের যশঃ দেশ বিদেশে প্রচারিত হইল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোর্স জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশেই তাঁহার উদ্ভাবিত টেলিগ্রাফ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যাহারা মোর্সের উদ্ভাবিত যন্ত্র ও বর্ণমালা সাহায্যে টেলিগ্রাফ প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে ইচ্ছা করিলে মোর্স অনেক অর্থলাভ করিতে পারিতেন কিন্তু উদার হৃদয় বৈজ্ঞানিক কাহারও নিকট হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। ইয়ুরোপের অধিবাসীরা এই পরম হিতকর আবিষ্কারের জন্য মোর্সকে পুরস্কার স্বরূপে স্বেচ্ছায় বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। মোর্স স্বীয় প্রতিভা বলে জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

আজ পর্য্যন্ত সকল দেশেই মোর্সের উদ্ভাবিত সাঙ্কেতিক বর্ণমালার সাহায্যেই তারের সংবাদ প্রেরিত হইয়া থাকে। বাঙ্গলা ভাষায় অ, আ, ই, ঈ প্রভৃতি ১৪টী স্বরবর্ণ এবং ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি ৩৬টী ব্যঞ্জনবর্ণ। এই সমস্ত বর্ণমালার সাহায্যেই কথা সকল লিপিবদ্ধ হয়। ইংরেজীতে মোট ২৬টী বর্ণমালার দ্বারা সকল কথা লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। টেলিগ্রাফের সাঙ্কেতিক বর্ণমালা বিন্দু (•) ও ড্যাস (—) বা ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা গঠিত হইয়াছে। বিন্দু ও ড্যাসের সাহায্যে ইংরেজী ২৬টী বর্ণমালার কাজ করা হয়। একটী বিন্দু ও একটী ড্যাস্ বা ক্ষুদ্র রেখা, যথা •—দ্বারা A অক্ষর বুঝাইয়া থাকে। একটী ড্যাস ও তিনটী বিন্দু যথা, —••• দ্বারা B বুঝাইয়া থাকে। তিনটী বিন্দু যথা ••• দ্বারা C বুঝাইয়া থাকে। এইরূপে কয়টী বিন্দু ও ড্যাসের দ্বারা ইংরেজী ২৬টী বর্ণমালার কাজ করা হয়। শিক্ষা করিলে ঐ সাঙ্কেতিক বর্ণমালা দ্বারা সকলেই ইংরেজী কথা লিখিতে পারিবেন।

প্রত্যেক 'টেলিগ্রাফ' আফিসে একটী বা একাধিক যন্ত্র আছে। এক আফিসের যন্ত্রের সহিত

স্থাপন করিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া নিউ ফাউণ্ড্‌লেণ্ড্‌ দেশে গমন করিলেন। তথায় গিয়া তিনি একটী বিশাল ঘুড়ি প্রস্তুত করিলেন। অনেকেই তাঁহার অসাধারণ বৃহৎ ঘুড়ি দেখিয়া মনে করিল এই লোকটার নূতন রকমের ঘুড়ি উড়াইবার খেয়াল হইয়াছে। মার্কনি তাঁহার সেই সুবৃহৎ ঘুড়ির সহিত একটী সংবাদ ধরিবার যন্ত্র (Receiving instrument) সংযুক্ত করিলেন। সূতার পরিবর্ত্তে টেলিগ্রাফের তার দিয়া সেই ঘুড়ি উড়াইবার ব্যবস্থা হইল। তারের এক প্রান্ত ঘুড়ির সহিত এবং অপর প্রান্ত ভূপৃষ্ঠে স্থাপিত একটী তাড়িত যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইল। একদিন মার্কনি একটী উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে সেই অদ্ভুত ঘুড়ি উড়াইয়া দিলেন। পূর্ব্ব নির্দ্ধারণানুসারে সেই দিন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কর্ণওয়াল্‌ হইতে মার্কনির যন্ত্র সাহায্যে সংবাদ প্রেরিত হইল। সেই সংবাদ মার্কনি আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পার হইতে তাঁহার ঘুড়িতে সংযুক্ত সংবাদ ধরা যন্ত্র সাহায্যে শুনিতে পাইলেন। মার্কনির বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। ইহা ১৯০১ সনের কথা।

এখন পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিনা তারে বার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে অনেক সুবিধা হইয়াছে। একদিন পৃথিবীর কোন লোক কল্পনাও করিতে পারিত না যে এক মুহূর্ত্ত মধ্যে শত শত মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব হইতে পারে। মোর্স সেই কার্য্য সাধন করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। মার্কনি বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৈজ্ঞানিক জগতে নব যুগের সূচনা করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাস তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

টেলিগ্রাফ আবিষ্কার হওয়াতে আমরা দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে অত্যল্প সময়ে সংবাদ প্রেরণ করিতেছি। তাহাতে দেশ সুশাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নানাবিধ কাজকর্ম্মের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে সমুদ্রগামী জাহাজ সকল তীর হইতে বহুদূরে সমুদ্রপথে বিপদগ্রস্ত হইলে সে বিপদ অন্য কাহাকেও জানাইবার কোনও উপায় ছিল না। এখন সমুদ্রগামী জাহাজ সকলে বিনা তারে বার্ত্তা প্রেরণ যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। জাহাজে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে এই যন্ত্র দ্বারা টেলিগ্রাফ করিয়া অন্য জাহাজের লোককে কিম্বা দূরবর্ত্তী নগরে সেই সংবাদ দেওয়া যায়। সুতরাং এখন সহজেই বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে উদ্ধারের জন্য সাহায্য প্রেরণ করা যাইতে পারে।

এখন পূর্ব্বোক্ত তারহীন সংবাদ প্রেরণ যন্ত্রদ্বারা মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত সুললিত সঙ্গীতধ্বনি বহু দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরিত হইতেছে। কোন সুগায়ক বোম্বাই সহরে বসিয়া গান গাহিলে তাহা কলিকাতার অধিবাসীদিগকে শুনান যাইতে পারে। কলিকাতা সহরে গীত সঙ্গীত ঐকান্তিক বাদ্য ও বক্তৃতাদি দুই তিন শত মাইল দূরবর্ত্তী পল্লীর অধিবাসীগণ শুনিয়া আনন্দ ভোগ করিতেছে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল অত্যাশ্চার্য্য ব্যাপারের কথা কেহ কখনও বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

দিবা স্বপন

(শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য)

আজ দুনিয়ার গগন ভুবন ভরেছে আর্ত্তনাদে!
যত দুর্ব্বল দিশেহারা হয়ে নিয়ত কেবলি কাঁদে!
সকল রকমে নিঃস্ব সবাই,
তবু তাহাদেরে করিছে জবাই,
তারা অবিচারে ডাকে বারে বারে কাঙ্গালের ভগবানে!
বুড়া ঈশ্বর আছে কাণ খেয়ে, কিছুই শুনেনা কাণে।

আমি যে উদাসী আমারো হৃদয় ক্ষেপেছে অত্যাচারে;
ছুটে যেতে চাই, শুধু বাধা পাই অবিরত চারিধারে।
আষ্টে পৃষ্টে হায় কি বাঁধন!
বিফল হবে কি জীবন সাধন?
বোধনের বেলা রোদনে আমার সাধের স্বপন ভাসে!
কণ্ঠ নীরব হয়ে আসে ক্রমে গভীর হতাশ্বাসে।

কে আছিস্‌ ভাই শক্তিমন্ত, বাধা ভেঙ্গে কর গুঁড়া!
চাল্‌সে ধরেছে নয়নে যদিও, তবু কভু নহি বুড়া।
এখনো সঙ্গে পারিব চলিতে,
সকল দুঃখ ছুটিব দলিতে,
বিলাস-ব্যসন-পঙ্কে ডুবিনি, হৃদয় যায়নি মারা;
কান্ন-কাতর কাঙ্গালের কথা করে যে পাগলপারা!

man" এর "Wanted" 'এর পিছনে প্রতি মাসে সাত আট টাকা ব্যয় করেও কোন সুবিধা না হওয়ায়, গোবর্দ্ধনবাবু কখ্খনো কালাচাঁদবাবুর উপরে কোন কথা বলতেন না—"দুর্জ্জনং প্রণিপাতেন" নীতি অনুসারে সর্ব্বদাই তাঁকে মুরুব্বি মান্য করে চলতেন। তাই এ ক্ষেত্রেও তাঁর কথার কোন প্রতিবাদ না করে, ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা, Press billটা কি Assemblyতে Pass হবে বলে মনে হয়?" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—"এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—European membersদের ভেতরেও দল হয়ে গেছে কিনা!" হেঁ হেঁ করে হেসে গোবর্দ্ধনবাবু বল্লেন—"এ সব বিষয়ে আপনিই হচ্ছেন আমাদের authority আপনিই যদি না বুঝতে পারেন তবে কে আর বুঝবে!" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—"Politicsএর চর্চ্চা কিছুদিন করেছিলাম কিনা!"

এই সময়ে অঙ্কের মাষ্টার শচীন্দ্রবাবু এসে বারান্দায় উঠলেন এবং কোন কথা না বলে কালাচাঁদবাবুর গা ঘেঁসে থপ করে বসে পড়লেন। হেডমাষ্টার বাবুর অনুপস্থিতে কালাচাঁদ বাবুর স্কুলের ভিতরে এবং বাইরের সকলের কাছেই হেড্‌মাষ্টার সাজেন—অনেক স্থলে তিনি হেডমাষ্টার বাবুর চেয়ে ও যে অধিকতর কার্য্যদক্ষ সে কথাও ইঙ্গিত কর্ত্তে ছাড়েন না। শচীন্দ্র বাবুর এমন বেখাতির ভাবে এসে গা ঘেঁসে বসা, কাজে কাজেই, তাঁর পছন্দ হলনা। ভ্রূ কুঁচকে আড়চোখে শচীন্দ্র বাবুর পানে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "second classএর ঐ Mathematics এর Marksheet Submit করেছেন?" হেডমাষ্টারবাবু আপনাকে জিজ্ঞেসা কর্ত্তে বলেছিলেন।" কথাটা একেবারে মিথ্যা—হেডমাষ্টারবাবুর নামে তিনি অমন ঢের কথা চালিয়ে থাকেন। শচীন্দ্রবাবু জবাব দিলেন—"না শিগ্‌গিরই কর্ব্ব।" এজবাবে খুসী না হয়ে বিষণ্ণমুখে কালাচাঁদ বাবু বল্লেন "কি যে করেন বুঝি না—অঙ্কের কাগজ ফল মিলিয়ে নম্বর দেওয়া ছাড়া ত আর কিচ্ছু নয়—এতেই এত দেরী করেন—history কিম্বা ইংরিজীর paper হলে যে একেবারে নেতিয়ে পড়্‌তেন! শচীন্দ্রবাবু কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে বসে রইলেন!

কিছুক্ষণ পরেই এসে জুট্‌লেন হেডপণ্ডিত। পণ্ডিত মশায় সদাই সপ্রতিভ এসেই বল্লেন—"বাঃ আপনারা আজ অগ্রেই সমবেত হয়েছেন দেখ্‌ছি—আমাদের শচীন্দ্রবাবুর বিরস বদন কেন?" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—"হেড্‌মাষ্টার বাবুর instruction মত ওঁকে কয়েকটা unpleasant কথা বলতে compelled হয়েছি—বোধ করি তাতেই offence নিয়ে থাক্‌বেন।" বেঞ্চের এক কোণে বসে পণ্ডিত মশায় বল্লেন—সে কি কথা! দাঁতের কামড় জিভে লাগ্‌লে কি কেউ কখনো দাঁতের উপরে অসন্তুষ্ট হয়! ক্ষুব্ধ হবেন না শচীনবাবু আপনি একটু হাসুন আমরা দেখি।" মনে যাই থাকুক না কেন, মুখে শচীন্দ্রবাবু বল্লেন—"না-না আমি ক্ষুব্ধ হই নাই—একটা কথা চিন্তা কর্চ্ছিলাম মাত্র!" পণ্ডিত মশায় বল্লেন—"অতি উত্তম! চিন্তার বিষয়টী যদি বন্ধুমণ্ডলী সমীপে প্রকাশযোগ্য হয়, তবে আপনার চিন্তাভারাংশবাহী হয়ে আমরাও কৃতার্থ হই—কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আপনি একটু হাসুন—মসী-কৃষ্ণ মেঘমণ্ডল "দংষ্ট্রাময়ূখৈঃশকলানি" করুন—সূর্য্যরশ্মি প্রকাশমান হোক!" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—ওঁর জন্যে কারো দু'দণ্ড গম্ভীর হয়ে থাকার যো নাই। শুনুন—আমি ভাব্‌ছিলাম—কদ্দিন থেকেই ভাব্‌ছি—এই আপনার গণেশ ঠাকুরের কথা!" পণ্ডিত মশায় বল্লেন—চমৎকার! দেব বিষয়ক ভাবনা অতি উৎকৃষ্ট—"যাদৃশীর্ভাবনাযস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—কি ভাব্‌ছিলেন?" মৃদু হেসে শচীন্দ্রবাবু বল্লেন—"ভাব্‌ছিলাম এই ধরুন, ঠাকুরের মাথাটা হচ্চে গিয়ে হাতীর—শরীরটা মানুষের এ অবস্থায় তিনি খাবেন কি? মুখ যা খাদ্য বলে গ্রহণ কর্ব্বে, পেট তা সইতে পার্ব্বে না—আবার পেটে যা সইবে মুখ তাতে তৃপ্তি পাবে না। এখন উপায় কি?" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—Most original conception! জবাব দিন পণ্ডিত মশায়। "পণ্ডিতমশায় বল্লেন—"জবাব অতি সোজা! আমাদের মতন দেবতাদের দৈনিক আহারের বালাই নাই—তাঁরা সবাই অমৃতপায়ী। একবার অমৃত পান করলে কখ্‌খনো ক্ষুধা তৃষ্ণার উদ্রেক হয় না।"

শচীন্দ্রবাবু কি যেন একটা বল্‌তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই হেড্‌মাষ্টার বাবুর বাড়ীর ভিতরে "সপাং সপাং" বেতের আওয়াজ এবং সঙ্গে একটী স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুনা যাওয়াতে সবাই চুপ্ করলেন। স্ত্রীলোকটী

আছে।—তা হলে—একখানা application পাঠাই—কি বলেন!" হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন—"না—না এখন নয়। picnic এর পরে পাঠাবেন—আগে সাক্ষাৎ—সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা হওয়া দরকার। আপনি ব্যস্ত হবেন না। লোক নেবার আরও মাসখানেক দেরী আছে। বাইরের application ও পনর দিনের আগে invite কর্ব্বে না। যে আজ্ঞে বলে সেক্রেটারী চলে গেলে, গোবর্দ্ধনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—Sub divisional officerকে নেমন্তণ কর্ব্বেন নাকি? হেডমাষ্টার হেসে বল্লেন—"পাগল আর কি! ও কথা না বল্লে টাকা দিতনা—বুঝলেন না 'এটা হচ্ছে গিয়ে a kind of pumping" গোবর্দ্ধনবাবু বললেন "দেখলেন কাণ্ড' পরের টাকা অফিসে জমা না দিয়ে কেমন পকেটে পুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—Office hours এর পরে কোন টাকা accept করারইবা কি দরকার। "হেডমাষ্টার বাবু বল্লেন—"ও সব হচ্ছে ওয়াশিল ছণ্ট করার কায়দা—চোরের অশেষ বুদ্ধি!' কালাচাঁদবাবু জিজ্ঞাসা করলেন "Secretary র post কি সত্যিই Vacant?" হেডমাষ্টার বল্লেন—"হাঁ, হলেই বা ওর মতন অকাট মূর্খকে অত বড় একটা responsible post offer কর্ব্বে কেন! "পণ্ডিত মহাশয় বল্লেন জগৎ-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সংবাদই আমাদের হেডমাষ্টার মহাশয়ের নখদর্পণে! গম্ভীরমুখে কালাচাঁদবাবু বল্লেন—Administration এর Fundamental Principle হচ্ছে latest news collection আর সেগুলোর Judicious application. হেডমাষ্টারবাবু কোন কথা বল্লেন না। শচীন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—আসছে meeting এর notice এ আমার increment এর item টা বাদ পড়ে গিয়েছে। হেডমাষ্টারবাবু বলেন—"না বাদ পড়ে নাই ও টাকে miscellaneous এর item এ ফেলে দিয়েছি। এই সময়ে দূরে চশমাচোখে একটা লোককে আসতে দেখে পণ্ডিত মশায় বল্লেন রাস্তার মোরে কবিবর উদিত হয়েছেন দেখছি। হ্যাঁ এই দিকেই আসছেন। একটু ভাল করে দেখে গোবর্দ্ধনবাবু বললেন—পকেট হাতড়াচ্ছে—বোধ হয় একটা পদ্যটদ্য কিছু লিখে এনেছে। কালাচাঁদ বাবু বিরক্তিপূর্ণস্বরে বল্লেন—এই, এখন ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে কানের মাথা খাবে। মুখে যা দুর্গন্ধ—কাছে বসে কার সাধ্য।" হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন—"বস্‌বে ত এসে আমারই গা ঘেঁসে। ঘরের কোণ থেকে ঐ মরচে ধরা লোহার চেয়ারখানা বের করে নিয়ে আসুন ত বিমলবাবু অপদার্থটাকে বস্‌তে দেব—চেয়ারে বসতে পেলে খুসীও হবে, আমরাও রক্ষে পাব!" ঘরে ঢুকে বিমলবাবু বল্লেন—চেয়ারের উপরে একটা ঘেয়ো কুকুর শুয়ে রয়েছে যে। হেডমাষ্টারবাবু হুকুম দিলেন—তাড়িয়ে দিন না। বিমল বাবু তাড়াতে লাগলেন—"ধেৎ—যা—দুর আরে মোলো কামড়াবে না কি—যা—যা—দুর দুর। কুকুর চলে গেলে বিমলবাবু বললেন—আঃ কি দুর্গন্ধ। একখানা ন্যাকরা পেলে চেয়ারখানা মুছে ফেলা যেত।" হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন—আরে মশায়, আপনি এনে বাইরে রেখে দিন না। মোছা হয়ে যাবে কবিবরের পোঁদের কাপড়ে। ডান হাতে নাক টিপে ধরে, বাঁহাতে চেয়ারখানা বিমলবাবু কোন রকমে এনে বারান্দায় এক কোণে রেখে বল্লেন—"ভারি দুর্গন্ধ কবিরব বসতে পারলে হয়।" গোবর্দ্ধনবাবু বল্লেন—"খুব পার্ব্বে—ওর কি দুর্গন্ধ সুগন্ধ জ্ঞান আছে। পণ্ডিত মহাশয় বল্লেন—ওর মুখের যা দুর্গন্ধ ঘেয়ো কুকুরের চেয়ে সেটাও বড় কম নয়! সেদিন থিয়েটার শুনতে গিয়ে দুর্ভাগ্যবশতঃ ওর কাছে বসেছিলাম। আরে বাপ রে বাপ! গন্ধে আমার ত অন্নপ্রাসনের অন্ন উঠে যাবারই উপক্রম। গোবর্দ্ধন বাবু বল্লেন—"একদিন আমার কাছে গল্প করেছিল যে ওর নাকি সিংহরাশ্—"সিংহরাশের লোকের মুখে নাকি ওরকম দুর্গন্ধ হয়েই থাকে।" হেডমাষ্টার মশায় বল্লেন—'সিংহরাশি না ঘোড়ার ডিম! মূর্খ, বাঁদর কোথাকার, ওর হচ্ছে "বরাহরাশি।" সকলেই হাসতে লাগলেন। শচীন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কবিবর নাকি চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন?" হেডমাষ্টার বল্লেন যাবেন কোন চুলোয়! অন্য জায়গায় গেলে তের টাকার বেশী মাইনেই হবে না। কাজের লোক হলে ত তাকে মাইনে দিয়ে রাখে—এখানে মোটা মাইনে পাচ্ছে নানা কারণে।" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—"সেদিন বল্‌ছিল Star theatre নাকি ওকে sixty rupees offer দিয়েছে!" হেডমাষ্টারবাবু বল্লেন—"বিশ্বাস কর্ব্বেন না—ভুলেও সত্যিকথা বলা ওর অভ্যেস নেই—sixtyর ঐ zero টা বাদ দেবেন। ছ' টাকা

কবিবরের রসিদ চাওয়ার কৈফিয়ৎ শুনে কালাচাঁদবাবু চাপা সুরে বল্‌লেন "বাঁদর"। গোবর্দ্ধনবাবু জুতোর ফিতে বাঁধার অছিলায় মুখ নীচু করে হাস্‌তে লাগ্‌লেন—শচীন্দ্রবাবু অন্যদিকে তাকালেন—হেডমাষ্টার প্রকাশ্যেই হেসে বল্‌লেন—"ওঁ এই কথা তা কাল পাবেন। বিমল বাবু দেবেন।" কবিবর বল্লেন—"বিমলবাবুর রসিদ নিচ্ছিনে—আপনার শ্রীহস্তের দস্তখতি রসিদ চাই—হা · হা—হা। "হেডমাষ্টার বল্লেন কোন চিন্তা নাই—সমস্ত রসিদেই আমি দস্তখত ক'রে থাকি।" কবিবর কি যেন একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে স্কুলের মৌলভী সাহেবকে ছুটতে ছুটতে আস্‌তে দেখা গেল। সকলেই বিস্মিত হয়ে সেই দিকে তাকালেন।

(আগামী বারে সমাপ্য।)

পল্লী-সাহিতের উপাদান

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বেদান্তশাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ]

আজ বঙ্গ-সাহিত্যের মোহন বাঁশরী নগরীতে নগরীতে বাজিয়া উঠিয়াছে, মহানগরীর বক্ষ হইতে বাঁশরীর সুর ক্ষুদ্র নগরীতে ও উপনগরীতে ধ্বনিত হইয়া পল্লীর প্রান্তে আশ্রয় লইতেছে। জানি না এই শ্রুতিবিমোহন বাঁশীর সুরের গতি কতদূর, জানি না এই সুর পল্লীর গোঠে মাঠে বাটে প্রতিধ্বনিত হইয়া পল্লীর অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিবে কিনা, এবং প্রবেশ করিয়া সেই স্থানে স্থায়ী আবাস স্থাপন করিবে কিনা!

"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মম প্রাণ ;—"

বাঁশীর সুর যদি মন প্রাণ মথিত করিয়া মর্ম্মস্থলে গ্রথিত হইয়া যায় তবেই সেই সুর সুরাসুর বন্দনীয় পরমানন্দ কন্দ অমন্দ মধুর ব্রজসুন্দরের প্রীতিজনক হয়।

একদিন বৈকুণ্ঠপতি ব্রজসুন্দর যমুনাপুলিনে, বৃন্দাবনের বনে বনে মোহন বাঁশরী বাজাইয়া ষোড়শ সহস্র গোপ-রমণীর মন প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আর আজ হুগলী নদীর তীরে তীরে কলিকাতা মহানগরীর বক্ষে বসিয়া কতিপয় বঙ্গ-সাহিত্যিক গল্প ও উপন্যাসের ভিতর দিয়া মোহন বাঁশরী বাজাইয়া বোধ করি ষোড়শ সহস্র নারীর নহে, লক্ষ লক্ষ নরনারীর চঞ্চল হৃদয় আকুল করিয়া তুলিতেছেন; মুহ ধাতুর অর্থ মুগ্ধ করা বোধ করি বা অনেক সহস্রকে মুগ্ধ, মোহিত, করিতেছেন। এই শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টিতে আনন্দ ঘন রসময় রাসেশ্বরের সন্ধান মিলিবে কিনা জানি না, কিন্তু বাঙ্গালার নগরে ও গ্রামে একটা বিশেষ চঞ্চলতার সাড়া পড়িয়াছে, একটু অস্থিরতা অনুভূত হইতেছে, হয়ত বা সেই চঞ্চলতা ও অস্থিরতা নিবন্ধন সামাজিক ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইবে।

সাহিত্যের সৃষ্টি কি শুধু তরুণ তরুণীর প্রাণে চঞ্চলতা আনিবার জন্য? রসের সৃষ্টি কি শুধু অনাঘ্রাতপূর্ব্ব সুকুমার কুসুমরাশির পেলবতা ও কোমলতা নষ্ট করিয়া উহার সৌন্দর্য্য হানির নিমিত্ত? তা নয়, তা নয়। সাহিতের সৃষ্টি সমাজের, দেশের, পরিবারের, এমন কি ব্যাপকভাবে সমগ্র জগতের হিত সাধনের জন্য। সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও ঐ হিতের কথাটিই ব্যক্ত করে। হিতের সহিত বর্ত্তমান সহিত, সহিতের ভাব সাহিত্য। সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির ও সমগ্র ধর্ম্মের সহিত যেই স্থানটুকুতে মিল রহিয়াছে, যেখানে কোনো দেশের কোনো জাতির কোনো ধর্ম্মের বিরোধ নাই তাহাই সাহিত্য। সস্কৃত ভাষায় ইহাকে বলা রহিয়াছে 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্', 'রসো বৈ সঃ'। এই রসের সমুদ্র মন্থন করিতে চাই কি? চাই শক্তি, চাই স্বাস্থ্য। দুর্ব্বলের হৃদয়ে রসের নির্ঝরিণী রিনি ঝিনি ধ্বনি তোলে না, বলহীনের প্রাণে আত্ম-অনুভূতি হয় না;—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

উপনিষদ্ যুগের সাহিত্য আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। বৈদিক যুগের সাহিত্য আমাদিগকে জানাইতেছে, মানবের হৃদয়ে যদি সাহিত্যের চাষ করতে চাও তবে আগে তার দেহের চাষ কর, সর্ব্বাঙ্গে স্ফূর্ত্তি আসিবে ইহার উত্তর আমি "প্রাচীন ভারতে কৃষি" নামক এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, সেই প্রবন্ধ অনেকদিন পূর্ব্বে মাসিকপত্রে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। (প্রাচী, ১৩৩১ শ্রাবণ)

* জামালপুর সাহিত্য সভায় পঠিত

ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ বেদ, জগতের অন্ধতমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের সাক্ষী সাম, যজু, ঋক্, অথর্ব্ব, সাহিত্য প্রচার করিতেছে "ওহে ঋষি তুমি ভূমির মূল্য বুঝ, ওগো গৃহস্থ তুমি হল কর্ষণ কর।"

"শুনং নঃ ফালা বিকৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাসা অভিযন্তু বাহৈঃ।
শুনং পর্জ্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসুধত্তম্॥
ঋক্ ৪।৫৭।৮

(অর্থ) লাঙ্গলের ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক রক্ষকগণ বলীবর্দ্দ সমূহের সহিত সুখে গমন করুক (যেদিকে বলদগুলি যায় ঠিক সেইদিকে উহাদের পেছনে পেছনে লাঙ্গল ধরিয়া যাক্।) পর্জ্জন্য (মেঘ) মধুর জলের দ্বারা ভূমি সিক্ত করুক, হে শুনাসীর, তুমি আমাদিগকে সুখ প্রদান কর। শুনাসীর অর্থ ইন্দ্রদেব।

মা বসুন্ধরার অণুতে অণুতে, তনুতে তনুতে, সর্ব্ব অঙ্গে অগণ্য বসু, অসংখ্য রত্ন। ওহে বসুমতীর সন্তান, তুমি যদি সেই রত্ন আহরণ না করিবে, তবে তোমার সন্তানত্ব কোথায় মায়েরই বা মাতৃত্ব কোথায়? মায়ের বিশাল বক্ষজোড়া দুধের সমুদ্র, অমৃতের ভাণ্ডার তুমি যদি সেই ভাণ্ডার না চিনিলে তবে তুমি অন্ধ, তুমি যদি অমৃতের সন্ধান না পাইলে তবে তোমার মৃত্যু। অমৃতের অভাবে তুমি মৃত। ওগো বঙ্গবাসী তুমি যে বাঁচিয়া মরা, তুমি যে আজ নিকৃষ্ট অর্থে জীবনমৃত।

বাঙ্গালার সন্তান স্কুলে, কলেজে, টোলে, মক্তবে, মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করিবে এবং সেই শিক্ষার বিলাসে নিজের দেশের কৃষিকর্ম্ম ভুলিয়া যাইবে, গোমাতার সেবা বিস্মৃত হইবে, স্বাস্থ্য সঞ্চয়ে অমনোযোগী হইবে, ব্রহ্মচর্য্যের বাণীতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবে, শারীরিক শক্তি লাভে বীতস্পৃহতা দেখাইবে এই কি শিক্ষার উদ্দেশ্য? বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেতাবতী শিক্ষার ইহাই কি মুখ্য অভিপ্রায়? সকল দেশের সকল জাতির প্রাচীন এবং বর্ত্তমান তথ্য অনুসন্ধান কর, জানিতে পাইবে কোনো দেশই শিক্ষার মোহিনী আকর্ষণী দ্বারা নিজের দেশের মাটিকে ভুলাইয়া দেয় না অবশ্য যেই দেশে মাটি নাই, সেই দেশের কথা স্বতন্ত্র। সেই দেশ হাওয়ার থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, বিজ্ঞানের বলে জীবিকা অর্জ্জন করে। যেই দেশে মাটির অভাব নাই, যেই দেশ-মাতৃকা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা, আজ সেই দেশের সন্তান হাতে পুঁথি লইয়া কৃষিকে ভুলিতেছে। আমাদেরই দেশের রাজার ঘরের সন্তান রাজর্ষি জনক একদিন এক হাতে নিয়াছিলেন বেদ, এক হাতে লাঙ্গল। রাজার ছেলের সেই মহান্ আদর্শ কি আমরা গরীবের ঘরের ছেলেরা অবহেলা করিয়াই চলিব? আর শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি একমাত্র চাকরী হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই এক দরজা উত্তীর্ণ হইয়া যদি চাকরী গ্রহণই লক্ষ লোকের লক্ষ্য হয়, যদি বাঙ্গালার হাজার হাজার পাশ করা ছেলে চাকরী কোথায় চাকরী কোথায় বলিয়া হা-হুতাশে গগন পবন বিদীর্ণ করে, তবে বঙ্গবাসীকে আজ অধন্য বলিতে হইবে। বিজ্ঞদিগের বাক্য এখন আর কেউ শুনে না, বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মদ্বারা যে দেশের উন্নতি হইতে পারে তাহা আর স্মরণ করে না।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

এই সমস্ত উপদেশজনক বাক্য এখন বঙ্গবাসীর নিকট অশ্রদ্ধেয়, অপাঙ্‌ক্তেয়।

সাহিত্যের রচনার ভার যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের অধিকাংশই এখন যৌনতত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত, কেউ বা সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা বর্ণনে পটুত্ব অর্জ্জন করিতেছেন। বাঙ্গালার যেই পল্লীর কোলে শতকরা নব্বইজন লোকের বাস সেই পল্লী-সাহিত্য রচনায় কাহারও লেখনী চালিত হয় না, যদিইবা কাহারও কাহারও ক্ষুদ্র গল্পে সাধারণ দরিদ্র গৃহস্থের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয় তাহারও অধিকাংশ মনস্তত্ত্বের সমাধনেই পরিসমাপ্ত। বাঙ্গালার নানা অভাব অভিযোগ কি প্রকারে সমাধান প্রাপ্ত হয় সেই বিষয়ে কোনও সাহিত্য বড় দেখা যায় না।

বাংলা দেশের শস্যভূমি আজ কচুরিপানার প্রবল আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছে। সাহিত্যিকের সাধনা এই সমস্যার সমাধানে ন্যস্ত হইলে বোধ হয় বাংলার অধিকাংশ শিক্ষিত যুবক কচুরিপানার ধ্বংস সাধনে যত্নবান হইত। কাহারও গ্রামের পার্শ্বে কিংবা নিজ বাড়ীতে হয়ত ম্যালে-রিয়ার আবাসভূমি মস্ত বড় বন জঙ্গল রহিয়াছে। গ্রামের

কোন বিশেষ উৎসবে জীর্ণ পুরাতন লোককে আবার তরুণ করিয়া তোলে। সদ্যোজাত শিশুপুত্রের মুখ দেখিলে মৃত পুত্রের স্মৃতি একটা বিগত দুঃখ কাহিনী লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। আজ যদি তাহার সেই প্রাণপ্রতিম ছয়পুত্র জীবিত থাকিত তাহারাও ত এই শোভাযাত্রায় যোগদান করিত। একটী নয়, দুইটী নয়, ছয় ছয়টী পুত্র—কুলের দীপ কালের বাতাসে নিভিয়া গিয়াছে। এ লক্ষ্মীন্দরেই বা ভরসা কি?

বর্ষার মেঘের মত দারুণ সন্দেহ আসিয়া সদাগরের মনে হানা দিতেছিল। ক্রমে ছয় পুত্রের জীবন শূন্য দেহ—তাহাদের অন্তিম বিদায় বাণী মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। শোক স্রোত যেন দ্বিগুণ বেগে তাঁহার বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিতেছিল। বাহিরে উগ্র প্রফুল্লতা দ্বারা সেই রুদ্ধ স্রোতের মুখে পাষাণ চাপাদিয়া চন্দ্রধর অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের সঙ্গে পাশা খেলা জুড়িয়া দিলেন।

তাঁহার পশ্চাতে পতাকা বাহী ও আশাসোটাধারী পদাতিক সৈন্যের তের খানি ডিঙ্গা। তাহার পশ্চাতে দশখানি ডিঙ্গাতে নট নটীগণ নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। উপরে স্বর্গ দণ্ডে চাঁদোয়া তাহাতে মনি মুক্তার ঝালর। নীচে সোণা রূপার চৌকি—আবির কুঙ্কুমে রঞ্জিত তাহার উপর বিদ্যাধরী তুল্যা নৃত্যশীলা নর্ত্তকীগণ বিহার করিতেছে বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে বেতস লতার মত তাহাদের সুকোমল দেহ দুলিতেছে। তাহার পশ্চাতে চৌদ্দখানি ডিঙ্গাতে নহবৎ। উচ্চ গজারির স্তম্ভের উপর আকাশ মঞ্চ কোনটী অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি কোনটী গম্বুজাকৃতি বিচিত্র পক্ষীর পালকে যে সকল মঞ্চের চালে ছাউনি দেওয়া হইয়াছে। সেই মঞ্চের উপর বসিয়া রৌসনচকীর দল নহবৎ বাদ্য করিতেছে।

তাহার পশ্চাতে দশখানি ডিঙ্গাতে বিবিধ বাদ্যভাণ্ড। কারা, নাগারা, জগঝম্প, ঢাক, ঢোল, করতাল—কোলাহলে জলজন্তুগণ প্রমাদ গণিতেছে। তাহার পেছনে ষোলখানি ভাণ্ডারের ডিঙ্গা। চিনি সন্দেশ পিষ্টকাদি বিবিধ সুরসাল মিষ্ট দ্রব্যে পূর্ণ। লক্ষ্মীন্দরের মাতুল রত্নেশ্বর সাধু স্বয়ং ভাণ্ডারী। তাহার পশ্চাতে আতসবাজীর কুড়িখানি ডিঙ্গা। বাজিকরগণ আপন আপন ক্রীড়াকৌশল দেখাইবার জন্য রজনীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তাহার পশ্চাতে দশখানি ডিঙ্গাতে বিবিধ রঙ্গ রহস্য। মানুষ ভালুক সাজিয়াছে। কেউবা বানর সাজিয়া কেউবা বনমানুষ সাজিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য করিতেছে। জলের উপর এরূপ বিরাট শোভাযাত্রা আর কখনও কেহ দেখে নাই। তামাসা দেখিবার জন্য নদীর পারে লোক ধরে না। কোলাহলে আকাশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দাঁড়ের টানে নদীতে প্রলয় উপস্থিত। ঢেউয়ের আঘাতে নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কল্লোল কোলাহল মহাসমুদ্র পর্য্যন্ত পৌছিয়া বরুণ দেবের প্রবাল মন্দির কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। রাখাল বালকেরা পান চিনির জন্য ভাণ্ডারের নৌকার পাছে পাছে ছুটিয়াছে—বরের বাপের নামে নানাপ্রকার অশ্লীলছড়া বাঁধিয়া গাহিতেছে। রত্নেশ্বর সাধু তাহাদিগকে চিনি ও পান রসাল মিষ্ট দ্রব্য দ্বারা বিদায় করিলেন। ছেলেরা উল্টো সুর ধরিয়া চলিয়া গেল।

আসন্ন সন্ধ্যায় সেই বিশাল অর্ণবপুরী যাইয়া উজানী ঘাটে লাগিল। হস্তি ঘোড়ার মিছিল করিয়া উজানীর লোক বরযাত্রিগণকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য আসিল। দুই উচ্ছ্বসিত মহাসিন্ধু যেন পরস্পর মিশিয়া গেল। আতসবাজীর নৌকা হইতে বাজীকরগণ বাজী ছাড়িতে লাগিল। হাউই, শিলে, পঞ্চমুখী, জ্বালামুখী, আকাশ প্রদীপ শূন্যধূম প্রভৃতি কত রং বেরংঙ্গের বাজী—আকাশ চাম্পা আকাশে শত শত সুবর্ণ চাম্পাফুল ফুটাইয়া তুলিল। আসমান তারা নভোমণ্ডলে কোটী নক্ষত্রের মালা রচনা করিল। কদম্বক্রম, চন্দ্রক্রম শূন্যপথে উঠিয়া কোটীচন্দ্রের উদয় দেখাইল। তাহাদের কোনটী অর্দ্ধচন্দ্র কোনটী ষোলকলায়পূর্ণ, কোনটীতে গ্রহণ লাগিয়াছে। শত সহস্র মশালচী জ্বলন্ত মশাল হস্তে রাত্রিকে দিবসে পরিণত করিয়া চলিয়াছে। বরযাত্রীগণ কেউ গজে কেউ অশ্বে কেহ বা পাল্কীতে চড়িয়া উজানী নগরাভিমুখে চলিয়াছেন। মধ্যে সেই প্রিয়দর্শন গন্ধর্ব্ব কুমার তুল্য লক্ষ্মীন্দরে রক্তবর্ণ অশ্বে সমাসীন। তাহার মস্তকে মণিমুক্তাখচিত মুকুট—গলায় রাঙ্গনের মালা। স্বর্ণখচিত উত্তরীয় বাতাসে দুলিতেছে।

নারী জাগরণের স্বরূপ

(শ্রীবিদ্যুৎলতা দেবী)

শুনতে পাই দেশ বিদেশের নারীগণ জেগে উঠেছে, শুধু ভারতের নারীরাই ঘুমিয়ে আছে। ভারতের নারীদের গভীর নিদ্রার জন্যই নাকি ভারতবাসী স্বরাজ বা স্বাধীনতা কিছুই পাচ্ছে না। কিন্তু আমরা আজও জানতে পাচ্ছিনা নারীদের জাগরণটা কিরূপ ?

যদি বছর বছর হাজার টাকার পোষাক বদলিয়ে পরাই নারী জাগরণের চিহ্ন হয়, যদি আমেরিকার ধনবতী নারীদের ন্যায় কাহারও কাহারও বিশ হাজার টাকার জুতা মোজা পরিধান নারী-সভ্যতার পরিচয় হয়, তবে তেমন ধারা জাগরণ বা সভ্যতা আমাদের দেশে আজও যে আসেনি তাহা সত্য।

জাগ্রত নারীরা স্কুলে কলেজে শিক্ষালাভ করবে, পুরুষদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পরীক্ষায় পাশ করবে, এবং পরে পুরুষদের ন্যায়ই চাকরী গ্রহণ করবে, এই যদি নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের পরিচয় হয়, তবে তেমন শিক্ষা বিস্তার আমাদের দেশে কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে বটে।

কিন্তু যে শিক্ষায় নারীকে পুরুষেরই ন্যায় চাকরী গ্রহণ করতে হয়, এবং প্রাতে দশটা থেকে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত কর্ম্মস্থানে কাল কাটাতে হয়, সেই শিক্ষায় নারীর নারীত্ব ও মাতৃত্ব থাকতে পারে কিনা তাতে আমাদের সংশয় আছে।

নারী যদি দিবসের অধিকাংশ সময় চাকরী করে' কাটান এবং ভোরে বিকালে বিশ্রাম করেন অথচ প্রাতে ৮টায় ঘুম থেকে উঠেন তবে গৃহের কর্ত্তৃত্ব করবে কে ? চাকর ও পাচকের উপর ঘরকন্নার ভার অর্পণ করে' যদি অব্যাহতি লাভ করা যায়, তবে তেমন গৃহস্থের ভাগ্যে আমাদের দেশের সুপক্ক খাদ্য জুটবে কিনা সন্দেহ।

চাকর পাচক ও ঝি এই তিনের সহযোগে গৃহ মধ্যে প্রত্যহই ত্র্যহস্পর্শ লেগে থাকবে এবং অস্বস্তির অন্ত থাকবে না। হয়ত বা গৃহস্থ বা গৃহিণী কোনো কোনো দিন বাড়ীর অন্ন না পেয়ে হোটেল থেকে ভাত কিনে কিংবা ময়রার দোকান থেকে খাবার কিনে উদর পূরণ করবেন।

যে সন্তান নিজের উদরে জন্মগ্রহণ করবে সেই সন্তানকে ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে রাখলে নারীদের চাকরী বজায় রাখার সুবিধা হয় বটে, কিন্তু মায়ের মাতৃত্ব যে তাতে একেবারে নষ্ট হয়ে যায় ; সন্তান আপন মাকে মা ডাকতে না পেয়ে, মা ডাকবে কিনা ধাই মাকে। আপন মায়ের স্তনধারায় সন্তানের সর্ব্ব অঙ্গ পরিপুষ্ট না হয়ে, পরিপুষ্ট হবে কিনা কেনা মায়ের কেনা দুধে। একথা শুনলে ও যে দুঃখ হয়।

অনেক ঘরের অনেক ছেলেকে শুনেছি মায়ের স্তন থেকে বঞ্চিত করে, মাতৃহারা শিশুর মত বিলেতি দুধ খাইয়ে প্রতিপালন করা হয়, স্বাধীনতার দাপটে দেশের গরুগুলিও বোধ হয় বাঁচবে না।

শুনেছি আমেরিকার নারীরা তাদের সন্তানকে স্তন্যপান থেকে বঞ্চিত করেন এবং তাঁরা বলেন স্তনপান করালে নাকি তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে। অন্য দেশের রমণীর পক্ষে বোধ হয় যা ইচ্ছা তা খাটে কিন্তু ভারতের রমণীর তাতো খাটে না। ভারতের রমণী যে মাতৃরূপিণী, আনন্দদায়িণী।

যে সন্তান নারীর শরীরের রক্ত দিয়ে সৃষ্টি হয়, সে সন্তানকে কি মা স্তন থেকে বঞ্চিত করতে পারে ? না, ভারত নারী তা পারে না। ভারত রমণীর মত আদর্শ রমণী বুঝি জগতে নেই। অন্য দেশের রমণীরা শুধু স্বামী নিয়ে ঘরকন্না করে, অন্যান্য আত্মীয়বর্গ তারা চায় না।

ভারত রমণী তা পারে না, তারা চিরদিন থেকে স্বামীর আত্মীয় পরিজন, শ্বশুর শাশুরী ও দেবর ভাসুর নিয়ে ঘরকন্না করে এসেছেন।

এই একতাটাই সে সব চেয়ে ভালবাসে। কিন্তু নারী স্বাধীনতায় ভারতে বুঝি আর একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা থাকবে না। ভারত রমণী স্নেহ মমতায় জর্জ্জরিতা, ভারত নারী আমরা, আমাদেরও জাগতে হবে বটে কিন্তু সেই জাগরণটা কিরূপে ?

গৃহকর্ম্ম, সন্তান প্রতিপালন, স্বামীর সেবা, শ্বশুর শাশুরী গুরুজনের প্রতিশ্রদ্ধা, অতিথি সেবা, গো সেবা, গৃহে বারব্রত নিয়ম পালন করা। গৃহে থেকে দেশের জন্য স্বামী পুত্রের জন্য কায়মনোবাক্যে মঙ্গল কামনা করা। এই হচ্ছে নারীর কর্ত্তব্য কাজ। অথচ নারী গৃহে থেকেই সতত পুরুষদের সহায়তা করবে, তাঁদের উৎসাহ দিবে।

সপ্তদশ বর্ষ। | ময়মনসিংহ, পৌষ ও মাঘ, ১৩৩৬। | একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা

কামনা

(শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য)

ব্যক্তিগত মুক্তি, প্রভু, চাইনে আমি চাই ন, জগৎপিতা !
জাতির সাথে যুক্ত হৃদয়, মুক্ত হবো সবার সাধনাতে !
সবার সাথে বাঁচ্‌তে পারি, মর্‌তে হ'লে মর্‌বো সবার সাথে !
স্বদেশবাসী মেথর মুচি কাঙ্গাল কৃষক সবাই আমার মিতা !
স্তব স্তুতি সন্ধ্যে পূজা আমার কাছে এসব নেহাৎ তিতা !
তোমার কথা ভাবতে গেলেই মন যে কাঁদে গভীর যাতনাতে !
সমাজ স্বদেশ জাতির কথাই মর্‌ছি ভেবে সারা দিবস রাতে ।
নিজের স্বার্থ ভোলার মতো রেখো, প্রভু, অটুট্ তেজস্বিতা !

দূর করেছি দুঃখ-ভীতি, জাতির সেবায় যায় যেন এই প্রাণ !
সাচ্চা পথে চল্‌তে পারি, দাও গো এমন বিরাট হৃদয়-বল !
আর তো, প্রভু, সয় না মোটেই—সয় না তো আর আত্ম-অসম্মান !
কণ্ঠ নিরোধ, হাত পা বাঁধা, শুষ্ক চোখে নাই যে লোণা জল !
ঠিক দধীচির মতন যেন দুখীর হিতে জীবন করি দান !
জগদ্‌বাসীর আশীর্ব্বাদে মনের কবে থামবে কোলাহল !

হেড্ মাষ্টার বাবু

[শ্রীবীরেশ্বর বাগছী বি, এ]

মৌলবী সাহেব এসে বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে, উদ্‌ভ্রান্ত ...ত্তে হেডমাষ্টারের পানে চেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ...ার, আজ আমার সর্ব্বোনাশ হয়্যা গিছে — ময়দানে এট্টা ...ই বাধা ছিল, কলিমদ্দি চোরা সেডা চুরি করয়া পলাইছে! ...ন হেডমাষ্টার ছাড়া আর সবারই মুখে সহানুভূতি ফুটে ...ল। তিনিই হেসে বল্লেন—"আমি কি কর্ব্ব! স্বজাতীর ...স্বজাতিই নিয়েছে এর আবার কথা কি! চুপ্ করে বসে ...কুন— আর পারুন ত তার একটা গরু আপনি ও সরিয়ে ...নুন গিয়ে, বাধনের গোড়ায় বাঁধন পড়ুক!" শুনে মৌলবী ...হেব চটে বল্লেন— এডা কি কন ছার! আমার তিনশ ...মুরিদ— আমি খোদ এট্টা এলেম আদ্‌মী— আমি চুরি ...র্ব্বো গরু! আমাকে কাল ক্যাজুয়েল বিদায় মঞ্জুর করেন ...হুজরের ওক্ত উঠে আমি থানায় এজাহির দিতে চলে ...ব।" গম্ভীর হয়ে হেডমাষ্টার বল্লেন— "তা পার্ব্বনা— ...াপনি বেতনবৃদ্ধির দরখাস্ত করেছেন, ওদিকে আবার ...াপনার বিরুদ্ধে পাল্টা আরজী পড়েছে, যে আপনি ...লেদের Persian translation এর খাতা বাড়ী নিয়ে ...[illegible] দিয়ে correct করেন না। কাল এই ...তদন্ত কর্ত্তে সেক্রেটারী বাবু ইস্কুলে আস্‌বেন। অভি- ...াগ মিথ্যা হলে আপনার মাইনে বাড়বে। চাকরী কর্ত্তে ...ল কাল হাজির থাকা নিতান্তই দরকার। পাল্টা ...রজীর কথা সত্য নয়। কেউ মাইনে বাড়ার দরখাস্ত ...রলেই কোন রকমের একটা চক্রান্ত করে তাঁর মাইনে ...ড়া বন্ধ করে দেওয়াই হচ্ছে তাঁর বরাবরের অভ্যাস। ...ৌলবী সাহেবের ব্যাপার ও ঠিক্ তাই।

বিরুদ্ধ আরজীর কথা শুনে মৌলবী সাহেব অত্যন্ত ...স্মিত হয়ে বল্লেন— ছয় সাত খাম্ খাতা তা আর— বাড়ী ...তি যাব ক্যান—কেলাসে বস্যাই সার্যা ফেলি। হেড- ...ষ্টার বল্লেন— "সে কথা কাল বলবেন। মৌলবী সাহেব ...স্বরে বল্‌লেন—"তাদি যে আমার থানায় যাওয়া হয় ...।" সহানুভূতিসূচক স্বরে শচীন্দ্র বাবু বল্লেন— আপনার ...জের যাওয়ার দরকার নেই। একটা দরখাস্ত লিখে বাঙ্গলায় লিখলেও চলবে— লোক মারফত থানায় পাঠিয়ে দিন।" আশ্বস্ত হয়ে মৌলভী সাহেব বল্‌লেন— আচ্ছা, তাই গে করি।

মৌলভী সাহেব দ্রুতপদে বাড়ী মুখো রওনা হলে শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে হেডমাষ্টার বল্লেন— শচীন্দ্র বাবুর ত দেখ্‌ছি বেশ্ legal advise gratis দেওয়ার অভ্যেস্ আছে।" শচীন্দ্র বাবু কোন কথা বল্‌লেন না। কবিবর দাঁড়িয়ে বল্‌লেন— ভাল কথা মনে হয়েছে—আমার গাইটাও মাঠে বাঁধা রয়েছে— চাকর গিয়েছে বাড়ী—দেখিগে সেটা আছে কিনা। তাহলে বুঝলেন হেডমাষ্টার বাবু, কাল যেন আমার রসিদ পাই। হেসে হেডমাষ্টার বল্লেন নিশ্চই পাবেন।"

এই সময়ে একজন ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞাসা করল—হেডমাষ্টার মহাশয়ের এই বাড়ী! "কবিবর জবাব দিলেন—হাঁ। তার পরে হেডমাষ্টার বাবুর কাঁধে হাত দিয়া বল্লেন—"ইনিই হচ্ছেন, আমাদের হেডমাষ্টারে বাবু।" ভদ্র লোকটী হেডমাষ্টরের পানে চেয়ে কপালে দুই হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে বল্‌ল—"আমি আপনারই কাছে এসেছি।" প্রতি নমস্কার না করে হেডমাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন?" "স্কুলে নাকি একজন Asst teacher এর post vacant আছে?"

"হাঁ"

"আমি একজন Candidate—application লিখে এনেছি আপনার হাতে দিতে পারি কি?"

"বেশ দিন্।" ভদ্র লোকটী application দিল; হাতে নিয়ে হেডমাষ্টারবাবু বল্‌লেন—'উপরে উঠে এসে বসুন— কথাবার্ত্তা বলা যাক্।" ভদ্রলোক উপরে উঠে এলেন। অন্যান্য শিক্ষকেরা তখন যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। হেডমাষ্টারবাবু কালাচাঁদবাবুর পানে চেয়ে বল্লেন—"চল্লেন আপনারা!" কালাচাঁদবাবু বল্লেন—হাঁ—সন্ধ্যো হয়ে গিয়েছে। সবাই চলে গেলে হেডমাষ্টারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—

"আপনি কি Graduate?

"আজ্ঞে হাঁ।"

"B. A. তে কি কি Combination ছিল?

'Sanskrit, Mathematics, Mathematics এ honours ও নিয়েছিলাম'।"

fight কর্ত্তে চান কর্ব্বেন, কিন্তু অতটা stoop down কর্ব্বেন না।" হেডমাষ্টার তর্ক ধরলেন—"যদি শেষকালে একটা resolution হয়ে যায়। তখন ত school কেই suffer কর্ত্তে হবে।" সেক্রেটারী বল্লেন—"আমিত oppose কর্ব্বই—আমার সঙ্গে আরও দু চার জনও হয় ত কর্ত্তে পারে—তা সত্তেও যদি হয়ে যায় যাবে। বুঝব ভদ্রলোকের বরাত ভাল।" হেডমাষ্টার এ সম্বন্ধে আর কিছু না বলে জিজ্ঞাসা করলেন—"oppose করার সময়ে আমাকে expose কর্ব্বেন না ত?" হেসে সেক্রেটারী বল্লেন—"আরে না—না তা'লে কি কাজকর্ম্ম চলে! সেক্রেটারীর কাছে হেডমাষ্টার Confidential report সর্ব্বদাই কর্ব্বেন কিন্তু সেক্রেটারী তাঁকে কখ্খনো expose কর্ব্বেন না—এই হচ্ছে দস্তুর। "বলে সেক্রেটারী হাস্তে লাগ্লেন। আশ্চস্ত হয়ে হেডমাষ্টার বল্লেন—"মৌলভী সাহেবের কেসটা এখন গিয়ে enquiry করলে ভাল হয়।" সেক্রেটারী জিজ্ঞাসা করলেন—"এখানে তাঁকে ডাক্বেন?" হেডমাষ্টার জবাব দিলেন—ক্লাসে গেলে কি ভাবে কাজকর্ম্ম করেন, তা দেখারও একটা সুবিধা হতে পারে।" সেক্রেটারী যেতে স্বীকৃত হলে, হেডমাষ্টার দপ্তরীকে ডেকে মৌলভী সাহেবের ক্লাসে আরও দু'খানা চেয়ার দিয়ে আস্তে বলে, সেক্রেটারীকে নিয়ে ঘর থেকে বেরুলেন।

তাঁরা মৌলভী সাহেবের ক্লাশে দরজার সাম্নে যেতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে "আদাব আরজ" করলেন—ছেলেরা সবাই তাঁর অনুকরণ করল। ক্লাসে সাত আট জনের বেশী ছেলে ছিল না। দুখানা চেয়ার ইতি পূর্ব্বেই দপ্তরী দিয়ে গিয়েছিল। সেক্রেটারী এবং হেডমাষ্টার উভয়েই বসে মৌলভী সাহেবকে এবং ছাত্রদেরও বসার অনুমতি দিলেন। সবাই বস্লে, সেক্রেটারী বল্লেন—"মৌলভী সাহেব, আপনার বিরুদ্ধে একটা অপ্রীতিকর অভিযোগ শুন্তে পাওয়া যাচ্ছে। আপনি নাকি ছেলেদের translationএর খাতা বাড়ী নিয়ে গিয়ে লাল কালি দিয়ে শুদ্ধ করে দেন না।" মৌলভী সাহেব বললেন—"ছয় সাত খান খাতা, ছার, এহানে বস্যাই সার‍্যা ফেলি।" সেক্রেটারী বল্লেন—"তাই আমি দেখ্তে এলাম, এখানে বসে সেরে ফেলা সম্ভবপর হয় কি না। আপনি translation কত্তে দেন আমরা বসে দেখি।

কোন কথা না বলে মৌলভী সাহেব চেয়ার থেকে উঠে ছাত্রদের সম্বোধন করে বল্লেন—"ল্যাহো, ট্যান্সেলেট ইন্টো ফারছী ল্যাহো ফচর ফচর ল্যাহো—খুব হুসিয়ার!' ছেলেরা খাতা পেন্সিল নিয়ে তৈরী হলে, আরম্ভ করলেন- "পইলা দফে ল্যাহো, ফরদেঘোনা পাঁচীরের ইমারত গুলা বড় খাপ্ছুরত্ দেহাইতেছে।" একটী ছেলে তাড়াতাড়ি লিখে বল্ল—'হয়েছে, স্যার"। বাকী ছাত্রেরা তখনও লিখ্ছিল। তাদের উপরে বিরক্ত হয়ে মৌলভী সাহেব ধমক দিলেন—ফচর্ ফচর্ ল্যাহো—তোমরা বড় নালায়েক হইছে?" ছাত্রেরা ঘাড় নাড়লে, মৌলভী সাহেব দ্বিতীয় দফা সুরু করলেন—যাহার সঙ্গে পাছাড় ধরিয়া না পারিবা তাহাকে দুর হইতে ঢিলা মারিয়া দৌড় দিবা।" লেখা সারা হলে বল্লেন "ল্যাহো—ভাদ্দোর মাসে কদাচ গোসল করিবা না পানীতে অধিক ডুবাইলে জ্বর বেমারী হইতে পারে। ফচর ফচর ল্যাহো।" এই পর্য্যন্ত শুনেই হেডমাষ্টার এবং সেক্রেটারীর পক্ষে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে উঠ্ল। কোন রকমে গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে সেক্রেটারী বল্লেন—চট্ পট্ সেরে ফেলুন—বেশী লম্বা করার দরবার নাই।" মৌলভী সাহেব বল্লেন—"হঃ তাই করি ল্যাহো ময়দানে বাঁধা গরু চুরি করা ভাল নয়। চুরি করিলে ফাটক হইতে পারে। পারদ পক্ষে কদাপি চুরি করিবা না।" হেডমাষ্টার অল্প একটু হেসে বল্লেন এখন থামলে হয়না।" মৌলভী সাহেব বল্লেন "হঃ এই, আর এট্টা ল্যাহো ফচর ফচর ল্যাহো "পুলিশের দারোগা দেখিলে দুর হইতেই সেলাম করিবা কারণ উহারা হামেসাই আদ্মীগণকে তক্লিক্ দিয়া থাকে। আর না" ট্যানসেলেট ইন্টো ফারছী ল্যাহো—কচর কচর দেরী মৎকরো।

মৌলভী সাহেব বস্লে, সেক্রেটারী বল্লেন—"ওদের Persian translation কর্ত্তে দিলেই পারেন!" মৌলভী সাহেব জানালেন যে প্রায়ই তা দেওয়া হয়ে থাকে, তবে আজ তাঁরা এসেছেন বলে, তাঁদের সম্মানার্থে গোটা কয়েক উপদেশ মূলক কথা অনুবাদ কর্ত্তে দেওয়া হল। উপদেশের নমুনা শুনে সেক্রেটারী বড়ই কৌতুক অনুভব কচ্ছিলেন;

দানের গৌরবের ভিতরই নিজকে অমর করিতে চাহিল ও পরবর্ত্তী লোকদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করিতে চাহিল তখন হইতে ইতিহাস রচনার প্রথম সূত্রপাত হইল। যদি লিখিত অথবা মৌখিক কোনরূপ ইতিহাস না থাকিত তবে ইতর প্রাণীরা যেমন তাহাদের প্রত্যেকের জীবনের সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পরিবর্ত্তিদের জন্য রাখিয়া যাইতে পারে না এবং প্রত্যেককেই আবার অজ্ঞানতা লইয়া জীবন আরম্ভ করিতে হয়। সেই রূপ অদ্যাপিও মানুষ তাহার আদিম অবস্থায় থাকিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাহিনী লোকের মুখে২ গল্পাকারে রচিত ও প্রচারিত হইত। পরে সেই কাহিনী গাঁথার আকার ধারণ করিল এবং গায়ক ও চারণের মুখে মুখেই গীত হইয়া পরবর্ত্তি লোকদের কৌতুহল নিবারণ করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তীদের জন্য বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে লাগিল। অতঃপর সেই সকল গাঁথা গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ হইল ও সাধারণের ভিতর বহুল প্রচারের ব্যবস্থা হইল। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস রচিত হইল ভূর্জ্জা পত্রে কিন্তু প্রচারিত হইল পর্ব্বত গাত্রে ও শিলা লেখ্যে। মিশরের ইতিহাস লিখিত হইল পেপিরসে কিন্তু খোদিত রহিল পিরামিডের গর্ভ গৃহে। এই রূপে প্রাচীন কালে সভ্য বা অসভ্য সকল দেশে ইতিহাস রচিত হইল এবং প্রকৃতির গাত্রে অঙ্কিত রহিল। কাল ক্রমে রচিত ইতিহাসের অনেক কিছুই ধ্বংশ প্রাপ্ত হইল, কিন্তু প্রকৃতির গাত্রে অঙ্কিত ইতিহাসের কতক কতক পারিপার্শ্বিক চিহ্ন অর্দ্ধ বিলুপ্ত অবস্থায় রহিয়া গেল। এই সমস্ত ভগ্নাবশেষ হইতে আবার লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার আরম্ভ হইল। এই নব জীবনের মুহূর্ত্তেইতিহাসের বৃহত্তর গণ্ডী পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত ও আদৃত হইল। এই পুনরুদ্ধার কার্য্যে যে প্রণালী ব্যবহৃত হইল, তাহাই বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এই ক্ষেত্রে অবশ্য বলা আবশ্যক যে প্রমাণের অভাবে বিস্মৃত ইতিহাসের হয়ত সবখানি আবিষ্কৃত হয় নাই; ভবিষ্যতে হইতে পারে।

ইতিহাসের যতটুকু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা পাঠে ইতিহাসের কতক সনের অথবা ঘটনার নীরস সমষ্টি বলা চলে না। ভূতত্ত্ব যেমন পৃথিবীর আভ্যন্তরীন পরিবর্ত্তনাদির কারণ দেখাইয়া দেয়, ইতিহাসও সেইরূপ যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির উপর দিয়া উত্থান ও পতনের যেতরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে তাহার কারণ দর্শাইয়া সবগুলি ঘটনার ঐক্য সাধন করে।

আর্য্যজাতির উত্থানও পতন প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন লোকের মনে গভীর বিস্ময়ের রেখা টানিয়া দেয় কিন্তু ইতিহাস মানবের সেই বিস্ময় অপনোদন করিয়া কঠিন অথচ সরল সত্য কথা দেখাইয়া সবগুলি ঘটনার ঐক্য সাধিত করে।

ঐ ঐক্যবাদের জন্য ইতিহাসকে মানব বিজ্ঞান বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে; কারণ ইতিহাস মনুষ্যনীতি সংক্রান্ত কতকগুলি সর্ব্বজনীন ও সর্ব্বকালীন সত্য প্রতিষ্ঠা করিতেছে। এই সমস্ত সত্য মানব প্রকৃতির আভ্যন্তরীন পরিবর্ত্তন ব্যতীত মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবেনা।

এইরূপ একটী সত্য হইতেছে যে Uniformity of Nature বা প্রকৃতির ঐক্যবাদ। অর্থাৎ মানুষ একযুগে এক এক রকম অবস্থায় যে কার্য্য করিয়াছে। বিভিন্ন যুগে সেই অবস্থায় ও সেইরূপ কার্য্যই করিবে। এই ঘটনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশের ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। ষ্টুয়র্ট বংশের রাজা প্রথম চার্লস এর অত্যাচারে ও অবিচারে উৎপীড়িত হইয়া জনসাধারণ ক্রম্‌ওয়েলের নেতৃত্বাধীনে রাজা প্রথম চার্লস্‌ এর ছিন্ন মুণ্ডের উপর বৃটিশ সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিল। ক্রম্‌ওয়েল প্রবল পরাক্রমে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিলেন। আবার ক্রম্‌ওয়েলের মৃত্যুর পর রাজা দ্বিতীয় চার্লস্‌ সিংহাসনারোহণ পূর্ব্বক সাবধানতার সহিত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। বোর্বোঁ বংশীয় ফরাসীরাজ ষোড়শ লুইর মস্তক ও সেইরূপ অত্যাচারিত জন রোষে ধূলাবলুণ্ঠিত হইয়াছিল। স্বেচ্ছাচারিরাজ তন্ত্রের পরিবর্ত্তে ফরাসী দেশে সাধারণ তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের নেতা মহাবীর নেপোলিয়ান দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ দণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের প্রতাপ অস্তমিত হইলে অষ্টাদশ লুই পুনঃ পৈতৃক সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন ও সাবধানে রাজ কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই দুই ঘটনার ইতিহাস আরও পর্য্যালোচনা করিলে আমরা আরও সাদৃশ্য দেখিতে পাইব। রাজা দ্বিতীয় চার্লস এর ভ্রাতা দ্বিতীয় জেমস্‌ স্বীয় অদূরদর্শিতার ফলে প্রজাবৃন্দের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টি করিলেন এবং সিংহাসন

তাদের দুঃখে বেদনা জানানো কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়, আমরা ছাড়া তাদের খোঁজ খবর নেবার লোক কে আছে ?" চরণের দিকে একটা বিতৃষ্ণাসূচক মুখনাড়া দিয়া বিশ্বেশ্বরী রুক্ষভাবে জবাব দিল কষ্টে পড়েছে বলেই কি ওদের জন্য আমরা নিজেদের ধর্ম্ম খোয়াতে যাব নাকি ?—বলি বিধবা ধেড়ো মেয়ে হয়েও তুই ধর্ম্ম বলে যে একটা কিছু আছে তাকি মানবিনে।—কতদিন বলেছি ছোট লোকদের ছেলে মেয়েদের স্পর্শ করে অশুচি হোসনে--এই যে সময়ে অসময়ে তাদের কোলেকাকে নিয়ে নিজের পবিত্রতা নষ্ট করছিস, এর প্রতিকার কি করে হবে শুনি ?" "ছোট লোকদের কাছে গেলে, সেবা করলে অশুচি হতে হয় এত বড় কথাটা তুমি কোথা থেকে জানালে মা "ওমা তাকি আর আমি জানি না বামুনের ঘরের বিধবার ছোট লোকের ছায়া মারানোই পাপ, আর কেবল বিধবাই বা বলি কেন ভদ্র ঘরের সকল লোকদের পক্ষেই ত এটা শাস্ত্রের বিধান। এত সবাই মেনে চলে। তুই কেবল অলক্ষ্মী হয়ে জন্মেছিল বলেই—"

এসব বিষয়ে নিজের মাকে পরাভব করা অজিতর পক্ষে সম্ভবও নয় সাধ্যও নয়। ক্ষুব্ধভাবে কতকটা অভিমানের সুরে বলিল "আচ্ছা তোমাদের শাস্ত্রে ত অশুচি হলে চান করে শুদ্ধ হওয়ার প্রথা আছে—আমি না হয় তাই করব। চটপট ওদের জন্য দুটো রেঁধে তারপর বেশ একটু নাইয়ে বাড়ী আসব খন—চল চরণ আর দেরী করে কাজ নেই,—কষ্টত তোদের আর কিছু কম হয় নি।" মনে মনে দারুণ অসহিষ্ণু হইয়া বিশ্বেশ্বরী বিকৃতভাবে মাথা নাড়াইয়া চেঁচাইয়া বলিল "না না এই মাঘের শীতে রাত্রি বেলায় নাইতে তুই পারবিনে. অজিতা কথাটা আমার শুন্ বলছি। স্থির সঙ্কল্প অজিতা চরণের সাথে অগ্রসর হইতে হইতে নম্রস্বরে জবাব দিল না মা তোমার এ অন্যায় আদেশ আমি মানতে পারব না। অলক্ষ্মী হই আর যা হয় আমার সম্মুখে কয়টী প্রাণী অনাহারে মরবে এ অসহ্য—এমন সময়ে নিজের ঠুকনো ধর্ম্ম নিয়ে। বসে থাকলে ভগবানের রাজ্যে অপরাধ করা হবে।"

—দুই—

সে রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়া অজিতাকে কোন ঝগড়া বিবাদের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। রাগে দুঃখে বিশ্বেশ্বরীর হৃদয়টা এমনি নিপীড়িত হইয়া রহিয়াছিল যে নিদারুণ ক্রোধে তার পক্ষে কিছু বলা সম্ভবপর হয় নাই।

পরদিন দুপ্রহরে অজিতা পাড়ার রায়দের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল। বিশ্বেশ্বরী সবেমাত্র দিবানিদ্রা সমাপন করিয়া বিকালের কাজকর্ম্মে অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় ওপাড়ার গুনিঝি আসিয়া গল্প জমাইয়া বসিল। পাড়ার মধ্যে এই গুনিঝির প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। মেয়ে মহলে তাহাকে ছাড়া কোন ক্রিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারিত না, অধিকন্তু নানাপ্রকার কানাঘোষার সাহায্যে ষড়যন্ত্র গড়িয়া তুলাতে তার যথেষ্ট হাতযশ ছিল।

প্রাঙ্গনে ঢুকিয়াই কার্য্যোরত বিশ্বেশ্বরীর প্রতি সমবেদনা জানাইয়া প্রশ্ন করিল "দিদি যে বড় একা একা কাজ করে মরছ—তোমার মেয়ে কইগা ? বৃদ্ধ বয়সে কোথায় বসে বসে দুটী ভাত গিলবে তাও কিনা পোড়া অদৃষ্টে ঘটে উঠছে না। বলি বকাটে মেয়েটীর কি দয়মায়া বলে কোন জিনিষ নেই।" "এই বৃদ্ধ বয়সে কার না সুখভোগের ইচ্ছা হয় বোন, কিন্তু কি করব বল, মেয়ে ত আর আমার কথার বাধ্য নয়। পোড়ামুখিকে সারাদিন কি বকাঝকাই না করছি, কিন্তু শুধরে উঠার কোন লক্ষণই যেন ওর ভিতর নেই। দুপুর বেলা খেয়েদেয়ে সেইযে ঘোষেদের বাড়ীর বড় বউয়ের সাথে দেখা কর্ত্তে যাচ্ছি বলে বাড়ী থেকে বের হয়েছিল কই এখনও ত ফিরলে না ! ওকে নিয়ে আমি যে কি করব বোন তাই কেবল ভাবি। "বলি প্রত্যেক দিন এমনি সময় ঘোষেদের বাড়ী যাওয়ার ব্যাপারখানা কি বুঝলে দিদি,—কি করেই বা বুঝবে, ছুড়ী ত আর তোমাকে জানায়ে কোন কাজ করে না।

বিশ্বেশ্বরী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গুনিঝির দিকে চাহিয়া রহিলেন। গুনিঝি কিন্তু সুজাসুজি ব্যাপারখানা বলিবার পাত্রী নয়, সে বেশ ককটু ঘোরাফেরা করিয়াই ব্যাপার খানা বলিতে আরম্ভ করিল "ব্রাহ্মণ বিধবার মেয়ে ও নিজে বিধবা হয়ে কিনা ছোট লোকের মেয়ে ছেলেদের বলতে আমার বেঁধে আসছে দিদি, এর চেয়ে বাড়া পাপ কি আর জগতে আছে ?" বিশ্বেশ্বরী নিদারুণ ভাবে নিজ ভীত দৃষ্টিটা গুনিঝির দিকে স্থাপন করিয়া বলিল "প্রত্যেক দিন দুপুর বেলা ঘোষেদের বড় বউয়ের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি বলে চলে যায় আমি কি আর ছাই কোন খোঁজ খবর রাখি ?

প্রাণ আজ অতিষ্ট হইয়া উঠিল। করুণার অশ্রু আবেগ বোধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল—ক্ষণ পরেই যে মায়ের অজ্ঞাতে চরণের হাত ধরিয়া সে মণ্ডলদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল তাহা কেহ জানিতেও পারিল না।

—ছয়—

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসার পূর্ব্বেই পরাণ মণ্ডলের স্ত্রী দেহত্যাগ করিল। ছেলেমেয়েদের বুকফাটা কান্নায় বিচলিত হইয়া ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া চরণদের বাড়ীর কাছে উচু জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল। কার্য্যে না হউক মুখের সহানুভূতির তখন আর এতটুকু অভাব সেই জনতার ভিতর ছিল না। গুনিঝিও তার সেই লাঠিখানায় ভর দিয়া উপস্থিত ছিল। এই একটা শোচনীয় মৃত্যুর জন্য তাহার কথাবার্ত্তা আজ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

বাড়ীর কাছে সন্ধ্যা বেলায় এমনি একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল, বিশ্বেশ্বরীও একটীবার না আসিয়া পারিলেন না। গুনিঝির দিকে আগাইয়া আসিয়া তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া তিনি বলিলেন "বাড়ীর কাছে এমনি সময় এক বিপৎপাৎ হল, ভাবলুম একটীবার দেখে গিয়ে না হয় নাইয়েই বাড়ী ফিরব। আহা! চরণদের এই বিপদে এদের একটী স্বজনও বুঝি দেখতে এলে না! ছেলেমেয়েগুলির কিন্তু···। কিন্তু আর কিছু বলা সম্ভবপর হইল না। এতক্ষণে তাহার দৃষ্টিটা ওবাড়ীর উঠ'নটার দিকে গিয়া পড়িয়াছিল। বজ্রাহতের মত বিশ্বেশ্বরী দেখিলেন চরণের মার মৃতদেহটার পাশে শোকাচ্ছন্ন ভাবে অজিতা বসিয়া, পরাণ মণ্ডলের দু'বছরের সেই ছোট মেয়েটা কিনা তাহারই কোল আঁকড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

নৌকা বাইচের সাড়ি

[শ্রীদেবেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ]

নৌকা বাইচ একটা আমোদ জনক ব্যাপার। উহা পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় অনেক জায়গায়ই অল্প বিস্তর প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে ভাটী অঞ্চলের নৌকা বাইচের বেশ একটা বিশেষত্ব আছে। ভাটী অঞ্চলে নৌকা বাইচের অপর নাম "আরঙ্গ"।

কোন দিন কোন জায়গায় আরঙ্গ জমিবে তাহার নির্দ্দিষ্ট তারিখ আছে। শ্রাবণ মাসের শেষ দিন হইতে ভাদ্র ভরা এই আরঙ্গ হইয়া থাকে।

শুনা যায় পূর্ব্বে দুই তিন শত পর্য্যন্ত দৌড়ের নৌকা জমাট হইত। এখনও শ দেড়শ নৌকা হইয়া থাকে। দৌড়ের নৌকাগুলি সাধারণত ৫০।৬০ হাত পরিমাণ। ত'হাতে দুই দিকের গুড়ায় দুই সার লোক ছোট ছোট বইটা নিয়া বসে। হাইলের দিকে ৫।৬ জন খুব জোয়ান এবং শ্রম সহিষ্ণু ব্যক্তি থাকে, তাহাদের উপরেই নৌকার হার জিতের সম্পূর্ণ ভার। নৌকাগুলিকে সুন্দর স্থায়ীরংয়ে সাজান হয়!

কাহারও কাহারও নৌকার পূর্ব্বভাগ ঠিক ময়ূরাকৃতি তাহাতে রং থাকায় অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। এক একখানা নৌকার রং দিতে ২০।২৫ টাকারও অধিক ব্যয় পড়ে।

বর্ষাকাল চারিদিক জলে প্লাবিত থাকায় দর্শকগণের ও নৌকাতেই আরঙ্গে যাইতে হয়। আরঙ্গের স্থানে দুই দিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দর্শক মণ্ডলীর নৌকা গুলিকে রাখা হয়। মধ্যভাগ দিয়া বাইচের নৌকা গুলি ঠিক এক সময় হুহু করিয়া ছাড়ে। তখনকার দৃশ্য বাস্তবিক প্রাণে বেশ আনন্দ প্রদান করে। কাহার নৌকা সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দিষ্ট স্থানে নীতে পারিবে তজ্জন্য বাহকগণ প্রাণপণে বইটা চালায়। যাহার নৌকাখানা সর্ব্বাগ্রে গেল, তাহারই জয় হইল। সর্ব্বাগ্রগামী নৌকা ফিরিবার সময় ধীরে ধীরে বাহিয়া আনা হয়। সব ভাইকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নৌকার আগায় একখানা নূতন কাপড় অথবা গামছা পাতা হয়, তাহাতে দর্শক শ্রেণীর মধ্যে যাহারা নৌকা বাইচের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দেখিতে পায় নাই তাহারাও বুঝিল যে কাপড় দেওয়া নৌকাই জয়ী হইল। অনেক সময় অতি দ্রুতগামী নৌকা গুলির উচ্ছ্বসিত জল প্রবাহে কাঁড়ারী কিছুই দেখিতে পায়না বলিয়া কাঁড়ীর ঠিক রাখিতে পারে না।

তাহাতে দর্শকদের নৌকার মধ্যে বাইচের নৌকা উঠিয়া দর্শকদিগের নৌকা ডুবাইয়া দিয়া তাহাদিগকে মহাবিপদগ্রস্ত করিয়া তুলে। বাইচের নৌকায় নৌকায় ঠেসাঠেসী ত প্রায়েই ঘটে, ফলে বিবাদের সূত্রপাত, শেষে বাইচের স্থান মাথার রক্তে লাল হইয়া যায়, তখন দর্শক মণ্ডলী কে কোথায় পলায়ন করিবে এই দৃশ্য ভয়ানক দেখায়। বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই আছে, তজ্জন্য সকল বাইচের

(৪)

কোন কোন সখি তোরা যাবে গো জল ভরিতে,
(ওগো) জল ভরিতে (ওগো) জল ভরিতে।
সাজিয়া চল গো সখি জলের ঘাটে যাই,
(হাঁ হাঁ বেশ)
যে ঘাটে ভরিব জল সেই ঘাটে কানাই। (গো)
জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিয়া ঢেউ,
(হাঁ হাঁ বেশ)
হাসি মুখে কও কথা ঘাটে নাই কেউ। (গো)
জল ভর সুন্দরী কন্যা জলে দিয়া মন,
(হাঁ হাঁ বেশ)
কাইল যে কইচ্‌লাম কথা আছেনি স্মরণ। (গো)

আমেরিকার পত্র

[শ্রীআবদুল কাদের]

নমস্কারান্তে নিবেদন—

চক্রবর্ত্তী মশাই!

আপনার চিঠি যথা সময়ে পেয়েছি, কিন্তু ইহার উত্তর দিতে দেরী হল, তজ্জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাই। আমরা এখানে যত লোক আছি, তন্মধ্যে অধিকাংশ অর্থাৎ শতকরা ৯৫ জন খেটে খাই ও মজুরের কাজেতে বা এই রকম কাজেতে যেখানে কাজ খালি থাকে আমাদিগকে নিয়া নেয়, তাতে কোন পার্থক্য রাখে না। আমরা যত পয়সা বাঁচাতে পারি অন্যান্য লোকে অর্থাৎ এই দেশের লোকেরা তা বাঁচাতে পারে না; কারণ তাঁরা পরিবার নিয়ে বা মাতাপিতার সঙ্গে থাকে; কাজেই বেশী খরচা, তবে এ দেশের লোকেও অনেক পয়সা বাঁচায়; তারা আমাদের চেয়েও ভাল কাজ করে ও বেশী পয়সা পায়। আমরা অবিবাহিত ও এক সঙ্গে দু'তিনজন করে থাকি; আর এক একটা ঘরের ভাড়া, ৫০।৬০।৭০৲ টাকা ইত্যাদি যে যেমন ঘর চায় সেই অনুসারে ভাড়া দিতে হয়, সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর ঘর আছে; Steam-heated and not steam heated. Steam heated ঘরগুলার ভাড়া তুলনা হিসাবে অধিক। প্রত্যেক ঘরেতে লোহার নল আছে ও সেই নল দিয়ে Steam আসে, যখন Steam আসে তখন নলটা খুব গরম হয়ে যায় ও সেই গরমেতে ঘরগুলা গরম হয় ও শীতেতে কষ্ট পেতে হয় না। যে ঘরেতে Steam heat নাই সেই ঘরেতে যারা থাকেন তারাই gass stove কিনে gass জ্বালিয়ে ঘর গরম করে। এখানে প্রত্যেক ঘরেতে gass and electric বন্দোবস্ত আছে ও সেই সঙ্গে metre আছে। gass জ্বালিয়ে রান্না হয় ও electric বাতির কাজ করে। আবার কোন কোন স্থানেতে যেখানে নগর ছোট; সেখানে, কয়লার Stove ও কেরোসিন তেলের Stove ব্যবহার করে; এই সব Stoves এমন ভাবে তারা বসিয়ে দেয় যে ঘরের মধ্যে একেবারেই ধুয়া হয় না। অথচ ঘর বেশ গরম হয়। এখানে কাঠ পোড়ান হয় না ও gassতে খুব কম ও খরচা পড়ে। এখানে ৪ তালা হতে ৬৭ তালায় ঘর আছে ও প্রত্যেক ঘরেতে ১২টা পরিবার থেকে ১০০টা পরিবার থাকবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক পরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা কামরা বন্দোবস্ত ও তৎসহ পায়খানা ও স্নান করবার ঘর নির্দ্দিষ্ট। এই সব থাকবার জন্য ব্যবস্থা। এ দেশেতে প্রত্যেক জিনিষ পাওয়া যায়। যাঁরা নিরামিষ খান তাঁরা শাক সবজি কিনে রেঁধে খেতে পারেন রেঁধে না খেলেও Restaurant অর্থাৎ হোটেলেতে গিয়ে খেতে পারেন। যেখানে সেখানে হোটেল আছে, কারণ হিন্দু বা মুসলমানদের মত ইহারা কিছু বাচে না; যেখানে পাবে সেইখানে খাবে ও যাঁরা সর্ব্ব-ভক্ষক তাঁদের জন্যই ত অগাধ জিনিষপত্র। অবশ্য আমাদের দেশের গজা এখানে পাওয়া যায় না—তবে সেই প্রকারের মিষ্টান্ন আছে তাকে এ দেশেতে Candy বলে। এখানে পোষাক পরিচ্ছদের দর আমাদের দেশের অপেক্ষা অনেক অধিক। ৪০৲ টাকা হতে ১৫০৲ টাকা দাম। ৪০৲ টাকার নীচে পোষাক পাওয়া যায় না। পোষাক অর্থাৎ কোট প্যাণ্ট ও মেয়েদের পোষক কাচাতে এক ডলার অর্থাৎ ২৷৷৶০ আনা থেকে আড়াই ডলার অর্থাৎ ৬৶০ পর্য্যন্ত খরচা পড়ে জামা অর্থাৎ কামিজ কাচাতে ।৶০ থেকে এক টাকা খরচা পড়ে। এই ভাবে খরচাও খুব বেশী। এই দেশের খরচা বিলাতের খরচার দেড় গুণ। এ দেশেতে একটা ছেলেকে পড়াতে হলে কম পক্ষে ৩০০৲

আশাকরি পুত্র পরিবার সহ ভাল আছেন। আমরা ভাল আছি। আমাদের সকলের নমস্কার গ্রহণ করবেন ইতি। *

শিক্ষার আদর্শ

[শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস,]

আমি এবার এক বৎসরের জন্য বিলাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ইউরোপের অনেক দেশে বেড়িয়ে এসেছি। সে সব দেশে সব চুপচাপ—কোন গোলমাল নেই। ট্রেন ষ্টেশনে থামল—মানুষ গাড়ীতে উঠছে নামছে কোন গোলমাল নেই—সব চুপচাপ। জাহাজ ঘাটে লাগল—লোক উঠছে নামছে, কোন গোলমাল নেই, সব চুপচাপ। সেখানেও গোলমাল কখন কখন হয় বটে—তা ছাত্রেরা করে এবং পূর্ব্ব হতেই ঠিক করে আসে যে একটা কিছু করবে। তাকে rag অর্থাৎ গুণ্ডামী করা বলে। যেদিন তারা মনে করে যে rag বা গুণ্ডামী কর্ব্বে সেদিনই করে, তারপর সব চুপচাপ। আগে থেকে চুপ করে থেকে পরে শক্তিপ্রয়োগ কর্ত্তে হয়। আগে গোলমাল কল্লে পরে প্রয়োগ করার সময় শক্তি থাকে না। জাপানেও এরূপ দেখেছি, সব কাজ হচ্ছে চুপচাপ কোন গোলমাল নেই। যখন ইউরোপ ছেড়ে পোর্ট সৈদে এলুম তখনই কেবলই হৈচৈ, কেবলই গোলমাল। ডেক্ পেসেঞ্জাররা মারামারী হুড়াহুড়ী আরম্ভ করে দিলে। একবার এক জাহাজে এক মাড়োয়ারী ও এক মুসলমানে মারামারী লেগে গেল। চারিদিকের লোক তামাসা দেখতে লাগল, মেম সাহেবেরা হাসতে লাগল, এক সাহেব ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে এল। এডেনেও এইরূপ গোলমাল মারা মারী হুড়াহুড়ী দেখলুম। কিন্তু জাপানে এরূপ নয়। সেখানকার লোক সহজে চটে না। একজনকে আর এক জনে ঠেলে দিলে সে কিছুই বলে না, সহ্য করে রইল, কিন্তু যখন চটে তখন ভয়ানক। আবার চীনের লোকেরা অনেকটা আমাদেরই মত—জাহাজে উঠতে নামতে মারামারী হুড়াহুড়ী গোলমাল কর্ব্বে। শক্তি যে সংযম অভ্যাস করে প্রয়োগ কর্ত্তে হয়, এ তারা জানে না। যাদের শক্তি আছে তারা সংযম অভ্যাস করে বলেই শক্তি পায়। আমাদের রবিবাবু লিখেছেন যে "আমরা আগেই হৈ চৈ করে শক্তি ক্ষয় করে ফেলি, পরে কাজের সময় শক্তি থাকে না। এই হৈ চৈ খুব খারাপ এতে মানুষের শক্তি ক্ষয় হয়। বিশেষ করে আজ তরুণদের কথাই বলি। আমাদের এ দেশের তরুণগণ যখন কোন সভায় মিলিত হয় তখন বস্‌বার জায়গা নিয়ে তাদের ভিতর একটা হৈ চৈ হুড়াহুড়ী আরম্ভ হয়। এরূপ সংযমের অভাব হলে কি করে দেশের উন্নতি লাভ হতে পারে। আমি এস্থানে বসেছি, আমি কোন মতেই এস্থান ছাড়ব না। অন্য একজন এক স্থানে বসেছে তাকে সেখান হতে দূর করে আমি বসব এভাব থাকলে কিছুই হবার নয়। যে বড় হয় তাকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। সুতরাং ছেলেদের সম্বন্ধে এটা খুবই দরকারী কারণ এই তাদের শিক্ষার সময়। পরের প্রতি একটা দায়িত্ব জ্ঞান থাকা খুবই দরকার। আমি একটা জায়গা দখল করে বসেছি সেটা তাকে দিব না এই ভাব আমাদের দেশে সকলের মধ্যেই দেখা যায় কেবল ছেলেদের মধ্যে নয় বড়দের মধ্যেও দেখা যায়।

আমাদের মধ্যে দেখা যায় যে যত নিতে পারে সে তত বাহাদুর তত বড় লোক; এ ভাবটা পূর্ব্বে ভারতে ছিল না। এভাবটা পশুদের মধ্যেই দেখা গিয়া থাকে, তারা হাম্‌বড়া। একটা ষাঁড় যেখানে থাকবে, অন্যটাকে সেখানে কিছুতেই থাক্‌তে দিবে না। কিন্তু মৌমাছিদের মধ্যে তা নয় তারা দলবদ্ধ হইয়েই থাকে—এক সঙ্গে বাস কর্ত্তেই ভালবাসে। একে বলে Team spirit, এই জিনিষটা আমাদের খুবই দরকার। পূর্ব্বে এদেশে village community ছিল তাতে সবাই দলবদ্ধ হ'য়ে বাস কর্ত্ত। এখন আর এ ভাবটি তেমন নেই। এই ভাবটী এদেশে জাগায়ে তুলতে হবে। অন্যান্য দেশ দেখে দেখে আমাদের দেশের এই ভাব দেখে বড়ই দুঃখ হচ্ছে। আমাদের দেশে পরস্পর এক সঙ্গে থাকার ভাবটার বড় অভাব। আমাদের ভাব হচ্ছে আমি যতটা পারি নিয়ে নিব—তোমাকে দিব না। এই অবস্থটা খুব খারাপ।

ইংরেজী মতে একটা কথা আছে A Healthy mind in a healthy body আমি তার বাংলা করেছি "তন্ দুরস্তে মন দুরুস্ত"। বাস্তবিক শরীর ভাল না থাক্‌লে মনে তেজ আসবে কোথা হতে? Duke of

* শ্রীযুক্ত শশীধর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সৌজন্যে এই পত্রখানা মুদ্রণের জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। সৌঃ সঃ

যেন একটা বিষাক্ত তীরের আঘাতে, তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে চাহিল। আমিনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া এবং পরিহাসের সহিত তীব্র কণ্ঠে বলিল "বাদসা সাহেব! আমিত আপনার নিকট মুক্তি ভিক্ষার প্রার্থী নই। মানুষের অন্তর চিরদিনই মুক্ত, বাহ্যিক বন্ধনের অসীম তাড়নে, তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখ্‌তে পারে না। আমি এই রুদ্ধ কারাকক্ষে বসে, আমার মনকে নিয়ে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়াচ্ছি। উন্মুক্ত চিন্তা তরঙ্গে,—আমার মন আলোড়িত হচ্ছে,—এর প্রতিরোধ করবার শক্তি আপনার আছে? আমি যে দিন আপনার অন্তরে প্রবেশ করেছি সে দিনই, আমি স্বইচ্ছায় বন্দী সেজেছি। খোদা যে দিন মুক্তি দিবেন, সে দিনই মুক্ত হব? আমাকে মুক্তি দিবার আপনি কে? তবে—কক্ষের বাইরে স্বাধীন ভাবে চলবার কথা বল্‌ছেন,—তা' স্ত্রীলোকের পক্ষে সেরূপ স্বাধীনতা কোন দিনই বাঞ্ছনীয় নয়,—তা'তে বিপদের আশঙ্কাই যথেষ্ট।"

বাদসা সাহেব প্রত্যুত্তরে ঈষৎ যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া, তখনই আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন। তিনি সবেগে বলিলেন— সে রূপ কিছু বলার উদ্দেশ্য আমার নেই, তোমার অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় চলা ফেরার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে আমি এসেছি। আমিনা! আমাকে ক্ষমা কর, আমি না বুঝে তোমাকে বন্দী করেছিলুম—তজ্জন্য আমি খুবই অনুতপ্ত হয়েছি।"

বাদসার উক্তিতে আমিনার অন্তর অসীম উত্তেজনায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহার আননে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে ভ্রূকুটিবদ্ধ নেত্রে,—বাদসার প্রতি তাকাইয়া বলিল" ক্ষমা! ক্ষমা কর্‌বার আমি কে বাদসা সাহেব? আমি বাঁদী,—তা'র বেশী কিছু নই। বাদসার যিনি বাদসা একমাত্র তিনিই—আপনার ক্ষমা কত্তে পারেন। একটা অসহায়া স্ত্রীলোককে বন্দী করে, আপনি হয়ত, আত্ম-শক্তি স্ফুরণের পন্থা নির্দ্দেশ করেছেন,—কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার এ সমস্ত তৎপরতা, আপনার কাপুরুষতারই পরিচায়ক।

বাদসা সাহেব আমিনার পরিহাসের তীক্ষ্ণ-বাণে এতটুকু বিচলিত হইলেন না। আমিনার স্থির, ধীর, গাম্ভীর্য্য ও অকুতোভয়তা তাঁহার চিত্তে যেন একটা বিস্ময়ের প্রলেপ লেপিয়া দিল। বাদসা সাহেব নিতান্ত সহজ ভাবে বলিলেন" আমিনা! আমি তোমার প্রকৃত পরিচয় পেয়েছি। তুমি শত বাক্য বাণে জর্জ্জরিত করলেও—আমি তোমাকে প্রীতির চক্ষেই দেখ্‌ব।"

আমিনা অবাক বিস্ময়ে বাদসার প্রতি তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল—আমার প্রকৃত পরিচয় সংগ্রহ করেছে? সে আবার কিসে সম্ভবপর হতে পারে? দৌলৎ আমার অনেকটা পরিচয় পেয়েছে। দৌলৎ বাদসাকে সব প্রকাশ করে দিয়েছে? না—তা' হতে পারে না। প্রকাশ্যে বলিল "বাদসা সাহেব আমি ক্ষুদ্র নারী, আশ্রয়হীন, আমার কি পরিচয় আপনি সংগ্রহ করেছেন?"

বাদসা সাহেব শান্ত ও সংযত স্বরে, কাজী সাহেবের উক্তির সার অংশ, সরল ভাবে বিবৃত করিয়া ফেলিলেন। হোসেনের সহিত মতিয়ার বিবাহ দিতে তিনি যে কৃতসংকল্প হয়েছেন, তাহাও জানাইয়া দিলেন।

বাদসার উক্তিতে আমিনার শরীরে মধ্যে,—অকস্মাৎ যেন একটা আনন্দের শিহরণ, তরঙ্গ তুলিয়া চলিয়া গেল। বিজয় পূর্ণ আনন্দের একটা উৎকট হর্ষচ্ছটায় অমিনার আশা হত মলিন মুখ,—সুখোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা একটা গভীর দুর্ভেদ্য রহস্যের মতই প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সে মৃদুমন্দ হাসির ছটায়, মরকত মণিপ্রভ আরক্ত অধর রঞ্জিত করিয়া, সকৌতুকে উত্তর করিল "বাদসা সাহেব। খোদার ইচ্ছায়—অসম্ভব ব্যাপারও, বাস্তবে পরিণত হ'তে পারে,.. তিনি তাঁহার নিপুণ করস্পর্শে, এক মুহূর্ত্তে সমস্ত অস্বস্তি ও অশান্তির অবসান করে দিলেন। আমার পরিচয় আপনি পেয়েছেন,—হয়ত এই আত্ম গোপনের প্রসঙ্গ নিয়ে আপনি আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু বাদসা সাহেব! আজ আমার প্রাণে যে তৃপ্তির সঞ্চার হয়েছে, তাঁর তুলনা জগতে নেই। আমি যে মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য নিজকে অসীম বিপদ সঙ্কুল পথে ফেলে দিয়েছিলুম,—তার পশ্চাতে গভীর স্নেহের স্ফুরণ ছাড়া আর কিছু ছিল না। আজ আমার তৎপরতা সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে দেখে, খোদাকে শত শত ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অবশান গ্রহণ কচ্ছি। আমি ক্ষুদ্র নারী, আপনাকে খুবই প্রতারণা করেছি,—তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কচ্ছি।"

কলা সম্পন্ন করাবে,—তখন আমি,—আশার শেষ ক্ষীণ আভা টুকু মন হতে মুছে ফেল্‌তে বাধ্য হলেম। তাই আজ বিষ সংগ্রহ করে,—আমার অস্তিত্ব লোপ কত্তে বসেছি!

আমি তোমার পরিত্যক্তা,—তুমি আমার কেউ নও,—একথা ভাব্‌তেও আমার বুক ভেঙ্গে যেতে চাচ্ছিল,—তোমাকে ছেড়ে আর কেউকে পতি রূপে বরণ কত্তে হবে,—একথা চিন্তা কত্তেও,—আমার অন্তর, শতধা হয়ে ছিন্ন হতে চাচ্ছিল। যা কখনও ভাবিনি,—যা ঈপ্সিত নয়,—সে অবস্থা বরণ করে, কৃত্রিম অভিনয় কত্তে, যেটুকুন শক্তির প্রয়োজন, তাত আমার নেই! শৈশব হ'তে তোমাকেই চিনেছিলুম,—তোমাকেই চেয়েছিলুম,—তোমাকে পাবনা,… এত বড় অভিসম্পাত বরণ করার মত শক্তি সঞ্চয় করবার জন্যত প্রস্তুত ছিলুম না!

নারী সব ত্যাগ কত্তে পারে,—কিন্তু মনমাতানো পবিত্র ভালবাসার স্মৃতিটুকুন বিসর্জ্জন দিয়ে, আবার নূতন ভাবে মন গড়ে নিতে পারে না! যদি সেরূপ কত্তে চেষ্টা করে—তবে সে নিজে ত পুড়ে মরেই,—বিনা দোষে অপরকেও পুড়িয়ে মারে! এ ত তুমি বুঝ্‌লে না,—বুঝ্‌তেও চাইলেনা যদি কোন দিন,—এ অভাগিনীকে স্মরণ করে,—একটা দীর্ঘশ্বাসও যদি তার জন্য ফেল্‌তে চাও,—তবে মনে রেখো,—সে দীর্ঘশ্বাস টুকুনই—আশীর্ব্বাদরূপে,—আমাকে পরপারে শান্তি দিবে!

আজ মৃত্যুক্ষণে বল্‌ছি,—তুমি আমারি ছিলে, আজ পর্য্যন্ত আমারি আছ,—আমার মৃত্যুর পরও—আমি তোমারি থাক্‌ব। তুমি আমারি, এ স্মৃতি নিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি,—কাল, বিয়ের পরে, সে সৌভাগ্য হয়ত আমার ঘটে উঠ্‌বে না কাল হয়ত আমি অপরের হব,—তোমার ছায়াচিন্তা টুকুও ঘোর পাপ পঙ্কে ডুববার একটা অন্য উপাদান আখ্যা দিয়ে'—নরকের দিকে টেনে নিতে চাইবে। তাই—আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে বিদায় নিতে চাইছি। অনেক লিখবার ছিল,—লিখবার শক্তি ত আর নেই,—সবই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, শত অপরাধ ভুলে,—আমাকে ক্ষমা করো,—তবে যাই। এ জন্মের মত হতভাগিনী দৌলতন্নেছা বিদায়!

পত্র পাঠ করিয়া সাহাজাদা—একেবারে উন্মত্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। দৌলতের মুখের উপর দৃষ্টি সংন্যস্ত করিয়া অশ্রুর বাঁধ মুক্ত করিয়া দিলেন! শেষে অসীম অমঙ্গল চিন্তায়, উচ্ছ্বসিত হইয়া, বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া অন্দরের প্রায় সকলেই আসিয়া, কক্ষ মধ্যে জড় হইল। প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া, সকলেই অসীম অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। বাদসা সাহেব, "হেকিম" আনাইবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিয়া, স্বয়ং দৌলতের শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। বেগম সাহেবা উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া, দৌলতের সংজ্ঞাহীন দেহ বক্ষে টানিয়া লইয়া,—অশ্রুজলে বক্ষসিক্ত করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে, অন্দরের ছোট, বড় সকলেরই মুখে ভীষণ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

বঙ্গ সাহিত্যে বিপ্লব

(শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র রায়)

সমাজ বিপ্লব রাষ্ট্র বিপ্লব প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আজ কাল বঙ্গ সাহিত্যে ও ভয়ানক বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইলেই বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, এ কথা যথার্থ হইলেও বিপ্লবের ইহাই একমাত্র কারণ নহে। তীক্ষ্ণদর্শী ও ক্ষমতাশালী নেতার অভাবে যে অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দেয়, তাহাকেও বিপ্লব সংজ্ঞায় অভিহিত করা যাইতে পারে। বঙ্গ সাহিত্যের বর্ত্তমান বিপ্লব এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

বাল্যকালের কথা মনে হইতেছে—তখন বঙ্কিম চন্দ্র, হেম-নবীন, রমেশ চন্দ্র, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণ বঙ্গবাণীর সেবার্চ্চনায় নিযুক্ত। সে দিক্‌পালগণ অতি সতর্ক দৃষ্টিতে মাতৃ মন্দিরের এক এক দিক্ রক্ষা করিতে ছিলেন—কোন অনধিকারী প্রবেশ করিয়া মন্দির প্রাঙ্গন কলঙ্কিত করিতে পারে নাই। সেটা বঙ্গদর্শনী যুগ। বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র তখন সাহিত্য সম্রাট। বঙ্গদর্শনের সমালোচনা সম্মার্জ্জনী তখন সাহিত্য ক্ষেত্রকে সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত রাখিয়াছিল। তখন সাহিত্যের আসরে নামিয়া দু'চারজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর বাহবায় সাহিত্যসেবী বলিয়া পরিচিত হইবার যো ছিল না। সম্মার্জ্জনীপাণি

আহরণ করিয়া যেমন মধুক্রম রচনা করে, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণ তেমনি বিভিন্ন মানব চরিত্র হইতে সার সত্য টুকু উদ্ধার করিয়া লইয়া তদ্দ্বারা মানবাত্মার পুষ্টিকর উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করেন। ঐরূপ সুরচিত মধু চক্রে মানবাত্মা যুগ যুগান্ত কাল 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'—

বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন ঔপন্যাসিকগণের দৃষ্টি একটু দূরগামিনী ছিল। তাঁহারা শুধু লোকালয় দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না। লোকালয়ের বাহিরে কাননে কান্তারে মনুষ্য সমাজের যে একটা বিশিষ্ট ও গরীষ্ট অংশ বর্ত্তমান, তাহা তাহারা বিস্মৃত হইতেন না। গিরি কাননের সহিত লোকালয়ের যোগ বন্ধন আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সহিত বৈষয়িক জ্ঞানের সংমিশ্রন, তাঁহারা মানব জাতির পক্ষে অতি কল্যাণকর মনে করিতেন। একটা জাতি গড়ার পক্ষে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আছে কিনা জানি না। তবে দুচারখানা গ্রন্থে যে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না, এমন কথা বলা চলে না। ভালমন্দ সকল সময়েই আছে এবং থাকিবেই সংখ্যার আধিক্য এবং প্রাধান্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

আধুনিক ঔপন্যাসিকগণ প্রাচীনদের মত ততটা পরিশ্রমের আবশ্যকতা স্বীকার করেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা শুধু লোকালয়ের প্রতি বদ্ধ দৃষ্টি। সে দৃষ্টি সুলক্ষনা হইলে আমাদের অভিযোগের বিষয় বিশেষ কিছু ছিল না। আজ তাঁহাদের কলুষিত দৃষ্টি বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাঁরা ব্রীড়াসঙ্কুচিত অন্তঃপুর চারিনিগণকে নিতান্ত কুৎসিত ও উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বিশ্বের দরবারে উপস্থিত করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। সাহিত্যে এ হেন দুঃশাসনী নীতির সাদর সম্বর্দ্ধনা বাঙ্গালীর জাতীয়তার ইতিহাসকে নিতান্তই কলঙ্ক মণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে। শুধু কতক গুলি উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত তরুণ সাহিত্যিকের স্বৈরচারিতা আমাদিগকে ক্ষুব্ধ বা ভীত করিতে পারিত না। আজকালকার কোন কোন মাসিক সাহিত্য পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকারের গল্পোপন্যাস প্রচার এবং রমণীর সযত্ন লুকাইত বক্ষের লগ্ন চিত্র প্রকাশ অতি প্রশংসনীয় কার্য্য মনে করিতেছেন শুনিতে পাই ইহাই নাকি এ যুগে মাসিক সাহিত্যের জীবন রক্ষার এবং বিপুল প্রচারের সুচিন্তিত অথচ অব্যর্থ কৌশল!

সত্যই কি বাঙ্গালীর আজ এত দূর অধঃপতন? কিছু কাল পূর্ব্বে মার্জ্জিতঃরুচি শিক্ষিত সম্প্রদায় 'বিদ্যাসুন্দর' অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলিয়া ভারতচন্দ্রকে সাহিত্যের দরবার হইতে গলা ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। খুব বেশী দিনের কথা নয়, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র স্বামী স্ত্রীর প্রণয় সম্ভাষণ কাহিনী, বিবৃত করিতে যাইয়া বৃদ্ধ কালের অসাবধানতা প্রযুক্ত উহার সুখসমাপ্তি 'চুম্বন' কথাটী জিহ্বাগ্রে আসিবা মাত্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর দিকে চাহিয়া শঙ্কাকুল চিত্তে বলিয়াছিলেন—'মার্জ্জিত রুচি নবীন পাঠক হয়ত এইখানে বই পড়া বন্ধ করিবেন। আর আজ সেই বাঙ্গালী রমণীর লজ্জাকর অশ্লীল চিত্র কাহিনী নির্জ্জন অবসর বিনোদনের প্রধান সহচর রূপে গ্রহণ করিতেছেন ভাবিয়া, আমরা বড়ই বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। হায়! নেতৃহীন বাঙ্গালা সাহিত্য আজ তোমার বক্ষের উপর পৈশাচিক লীলাভিনয় দর্শন করিয়া, আমরা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি।

আমরা এক্ষণে কবিতা সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কাব্যিতা প্রসঙ্গে পদ্য সাহিত্যই আমাদের আলোচ্য বিষয় ইহা যেন কেহ বিস্মৃত না হন।

বর্ত্তমান বাঙ্গালায় 'মেঘনাদ বধ' 'বৃত্র সংহার' অথবা 'পলাশীর যুদ্ধের' ন্যায় কাব্যগ্রন্থের অত্যন্তাভাব বলিয়া আমরা দুঃখ প্রকাশ করিব না। কারণ প্রতিভা বিধাতার বিশেষ দান। উহা সকল সময়ে এবং সকল ব্যক্তিতে সমপরিমাণে বিতরিত হয় না। আধুনিক কবিতায় সিঙ্গাধ্বনি নাই। বীণার উচ্চ ঝঙ্কার নাই—আছে শুধু মধুকরের মৃদু আলাপন তাহাও না হয় কান পাতিয়া শুনিয়া কোন প্রকারে রস ভোগ করিলাম। কিন্তু যাহাতে কবিতার পদ্যত্ব—সেই ছন্দের সুপ্রণালী বদ্ধ বাঁধন ও শব্দাক্ষরে সুচারু বিন্যাসের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন আমরা অনুদ্বেগ চিত্তে সহ্য করিতে পারিতেছি না। বেদমন্ত্র যেমন গেয় এবং তাহা যথাযথ সুরতানে ধ্বনিত না হইলে জাগ্রত হয় না। তেমনি পদ্য ও গীতিকা বই আর কিছুই নয়; ছন্দোবন্ধন দোষে উহাতে সুর যোজনার ব্যাঘাত ঘটিলে নিতান্তই প্রাণহীন হইয়া পড়ে। কেহ দেবতার ধ্যানগত মূর্ত্তি গড়িতে যাইয়া

স্থির নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া ও একমাত্র সেই অংশটির উপরই ঝোঁক দিয়া আমরা তাহাকে কোনও বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করিয়া ফেলি কিন্তু প্রতি মানুষের মধ্যেই তাহার সমগ্র দিব্য সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে! শূদ্রকে তাই তার শূদ্রত্বের মধ্যে শক্ত করিয়া বাঁধা যায় না। ব্রাহ্মণও তার ব্রাহ্মণ্যের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ নহে। পরন্তু প্রত্যেকেই তার গভীরতর চেতনায় দিব্য মানবতার অপরাপর উপাদান সমূহ ধারণ করিয়া আছে। ঐ গুলিরও দিব্য সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার প্রয়োজন আছে।

অবশ্য কলিযুগে এই সকল উপাদান একটা অন্ধ অনিয়মের মধ্যে ক্রিয়া করিতে থাকে ও আমাদের সত্তার মাঝে একটা অরাজকতার সৃষ্টি করিয়া নব শৃঙ্খলা-লাভের সকল বিশৃঙ্খল প্রয়াসই ব্যর্থ করিয়া দেয়। মধ্যবর্ত্তী যুগের নিয়ম শৃঙ্খলা একটি অসম্পূর্ণ আদর্শেরই আশ্রয় নিয়া টিকিয়া থাকে—তখন কতকগুলি গুণের উৎকর্ষের জন্য অপর গুণগুলি দাবাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সত্যযুগের ধর্ম্ম হইতেছে আমাদের সত্তার সমগ্র সত্যের এক সুবৃহৎ বিকাশ। একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও স্বতঃসিদ্ধ দিব্য সামঞ্জস্যের উপলব্ধি এই বিকাশের উপায়। যুগাবর্ত্তের ক্রম প্রসারণের মধ্য দিয়া মানুষের সাধ্য অনুসারে যতটা সম্ভব, তাহার অধ্যাত্ম সত্তার স্বভাবসিদ্ধ আলো, জ্ঞান, শক্তি ও দিব্য গুণাবলীর ক্রম বিকাশের উপরেই ইহা নির্ভর করে।

পুস্তক পরিচয়

কানন কাহিনী—শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন সেন লিখিত। দাম ১।০ সিকা। প্রাপ্তিস্থান ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স ঢাকা ও ময়মনসিংহ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ইত্যাদি।

আমরা এই বইখানা পড়িয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। বিপদের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার প্রবৃত্তি জাগাইবার সহায়ক কথা বা কাহিনী আমাদের সাহিত্যে বিরল। এই দৈন্য দূর করিবার পক্ষে এই জাতীয় বইয়ের বহুল প্রচার আবশ্যক। বইখানিতে অনাবশ্যক অসম্ভাবিতার আশ্রয় নেওয়া হয় নাই, কোন প্রকার কুরুচির নিদর্শনও ইহাতে নাই। আমরা প্রত্যেক বালক-বালিকার হাতে এই বই দেখিলে সুখী হইব। বইখানির বহিঃসৌষ্ঠব ও উত্তম এবং অনেকগুলি সুন্দর চিত্রে ইহা আরও মনোরম হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় সৌরভের পাঠকবর্গ একখানি চিত্রের নমুনা দেখিতে পাইবেন

জগন্মাতা—মূল্য চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান রায় চৌধুরী এণ্ড কোং ১৩৫নং বৌবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

দি ওয়ার্ল্ড মাদার নামক ইংরাজী পত্রিকার প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা হইতে শ্রীহরিকুমার রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক অনুদিত এই পুস্তক বিক্রয় লব্ধ অর্থ 'নিমতা সমবায় মাতৃসমিতি লিমিটেডের সাহায্যার্থে প্রদত্ত হইবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে পুরুষের সহিত সমানাধিকার লাভের জন্য চেষ্টা না করিয়া যাহাতে প্রত্যেক নারী পূর্ণমাতৃত্বের অধিকারিণী হওয়ার জন্য সচেষ্ট হন তাহাই এই পুস্তকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। পুস্তকের উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু বক্তব্য বিষয়টী অনেকাংশেই দুর্ব্বোধ্য রহিয়াছে।

শোক সংবাদ

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক 'সিরাজুদ্দৌলা' গ্রন্থ প্রণেতা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আর ইহ জগতে নাই। গত ২৭শে মাঘ সোমবার প্রাতে রাজসাহী নিজ বাসায় পরলোক গমন করিয়াছেন। অক্ষয় কুমার ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্র অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বাধীন ভাবে ঐতিহাসিক আলোচনার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ঐতিহাসিক বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর নিকট তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া বিরাজ করিবে। দীঘা পাতিয়ার কুমার শরৎ কুমার রায়ের সাহায্যে তিনি যে বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা বারেন্দ্র ভূমির লুপ্ত ঐতিহাসিক বিভব বহুল পরিমাণে উদ্ধার সাধিত হইয়াছে। তাঁহার ভাষা ওজস্বিনী অথচ তাহাতে মাধুর্য্যের অভাব নাই। তাহার সম্পাদিত "গৌড়রাজ মালা" ও গৌড়লেখ মালা " ভাষার সম্পদ। অক্ষয় কুমার বাঙ্গালা সাহিত্যে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন সে সম্পদ চিরকাল বাঙ্গালী স্মরণ করিবে। আমরা তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।